আল্লাহ্‌র জিকির

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

আল্লাহ্‌র জিকির

আল্লাহ্‌র জিকির

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভূঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

আল্লাহ্‌র জিকির

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

প্রকাশক
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভূঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ
ফোনঃ ০১৭২৬২৮৮২৮০, ০১৬৭৭০৪২৮৯২

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী, ২০১১ ইং

প্রচ্ছদ
মফিজউদ্দিন খান

মুদ্রক
শওকত প্রিন্টার্স
১৯০/বি ফকিরেরপুল, ঢাকা–১০০০।
ফোনঃ ০১৭১১-২৬৪৮৮৭, ০১৭১৫-৩০২৭৩১

বিনিময়
একশত টাকা।

Allah'r Zikir: Written by Mohammad Mamunur Rashid and published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia. Exchange Tk. 100 US $ 10

ISBN 984-70240-0063-6

بسم الله الرحمن الرحيم

'আল্লাহ্‌র জিকির সর্বশ্রেষ্ঠ'। মহাবিশ্বের মহা প্রভুপালক একথাই বলেছেন। দ্বীন বা ধর্মের মূল বিষয় আল্লাহ্‌র জিকির। এই মূল ভিত্তির উপরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে ইসলামের স্তম্ভ চতুষ্টয়– নামাজ, রোজা, হজ্জ ও জাকাত- যেমন রূহের উপর স্থাপিত রয়েছে শরীর। রূহ ছাড়া শরীর মূল্যহীন– তেমনি আল্লাহ্‌র জিকির ছাড়া মূল্যহীন আমাদের সকল সৎকর্ম।

হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, 'যে জিকির করে সে জীবিত, আর যে জিকির করে না সে মৃত।' জিকিরময় ইমান বা বিশ্বাসই প্রকৃত ইমান। তেমনি জিকিরযুক্ত আমলই প্রকৃত আমল।

জিকির করা মানে স্মরণ করা, মনে করা। সুতরাং মনে মনে অর্থাৎ কলবে কলবেই আমাদেরকে জিকির করতে হবে। শুরু এভাবেই– শেষ অবস্থা হবে অন্যরকম। শেষে জিকির হবে। তখন কলবে জিকির হবে চিরপ্রতিষ্ঠিত। তখন কলব ফিরে পাবে তার আসল স্বভাব। জিকিরের নূরে হয়ে যাবে চিরদিনের জন্য বিলীন। হবে প্রশান্ত - সলীম। উল্লেখ্য, পৃথিবীর শান্তি ও পরবর্তী পৃথিবীর পরিত্রাণ নির্ভর করে সলীম কলব এবং প্রশান্ত প্রবৃত্তির (নাফসুল মুত্‌মাইন্নার) উপর।

যার কলবে আল্লাহ্‌র জিকির নেই, তার কথা শুনতে আল্লাহ্‌ নিষেধ করে দিয়েছেন। বলেছেন 'ওই ব্যক্তির কথা শুনো না, যার কলব আল্লাহ্‌র জিকির থেকে গাফেল'। আমরা এই নিষেধাজ্ঞাটি পালন করিনা বলেই প্রকৃত পথের দেখা পাইনা। প্রকৃত পথ (সিরাত্বল মুসতাক্বীম) তো তাঁদের পথ, যাঁদের কলব সতত জিকিরময়। তাঁরাই হচ্ছেন বিভিন্ন তরিকার পীর ও মোর্শেদ। তাঁরা নিজেরা কামেল (পূর্ণ) অন্যকেও কামেল করতে সক্ষম। তাঁরা কামেলে মোকাম্মেল।

তাঁদের কাছে আত্মসমর্পণ (বায়াত) না করলে আমরা কিছুতেই সত্য পথের সন্ধান পাবো না। বুঝতে পারবো না 'জিকির' এর প্রকৃত অর্থ কী। তাঁদের সোহবত থেকে দূরে থাকি বলেই আমাদের অনেকেই কেবল উচ্চারণকে বলি জিকির। 'স্মরণ' ও 'উচ্চারণ' এর পার্থক্য তো আমাদেরকে বুঝতেই হবে। জিকির এর সুষ্ঠু ও প্রকৃত ধারণা উপস্থাপন করাই 'আল্লাহ্‌র জিকির' নামের এই পুস্তকখানির উদ্দেশ্য। যার বোধ সুস্থ ও সুষ্ঠু নয়, তার কার্যাবলীও নয় শুদ্ধ ও সুষ্ঠু। হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে করেন সুষ্ঠু ধর্মবোদ্ধা (ফকীহ্)।

ধর্মের সুষ্ঠু ও সঠিক বোধসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের মহান সাহচর্যে তাই আমাদেরকে উপস্থিত হতেই হবে। নয় তো ধর্ম সর্ম্পকে সুষ্ঠু জ্ঞান আমরা পাবোই না। আল্লাহ্‌পাক তাই এরশাদ করেছেন– 'হে ইমানদারগণ ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং সত্যবাদীগণের সঙ্গী হয়ে যাও'।

খাস মোজাদ্দেদিয়া তরিকার একনিষ্ঠ মুরিদগণ 'আল্লাহ্‌র জিকির' প্রতিষ্ঠার ব্রত নিয়ে প্রত্যক্ষভাবে- পরোক্ষভাবে, আর্থিকভাবে, শারীরিকভাবে, দেশে-বিদেশে সর্বত্র সাধনা করে চলেছেন। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ- রাষ্ট্র এভাবে সমগ্র বিশ্বে যেনো জিকির প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় শান্তি। মহাকালের, মহাজীবনের, মহাশান্তি। তাই এরশাদ হয়েছে, 'আলা বিজিক্‌রিল্লাহি তাত্‌মাইন্নুল কুলূব' (মনে রেখো, অন্তরসমূহ শান্তিপ্রাপ্ত হয় আল্লাহ্‌র জিকিরে)।

আমাদের প্রতিটি প্রকাশনার প্রাক্কালে আমরা সবাইকে সত্য পথের পথিক হবার আমন্ত্রণ জানাই। এবারও জানানো হলো।

প্রারম্ভে ও শেষে সকল সময় আমরা বর্ণনা করি মহাবিশ্বের মহাপ্রভুপালকের প্রশংসা-পবিত্রতা, মহিমা-মহত্ত্ব, স্তব-স্তুতি, উচ্চতা এবং গৌরব। সকল প্রকার দরূদ ও সালাম রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক তাঁর প্রেমিক ও প্রেমাষ্পদগণের প্রতি। বিশেষভাবে তাঁদের শ্রেষ্ঠতমজন হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি। আমিন।

ওয়াস্ সালাম।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

মন-বনভূমি জাগে মাঝরাতে রোদনের মতো
প্রাণভরে পান করি সুগভীর তোমার জিকির
যদিও পিপাসা বাড়ে জ্ব'লে উঠে নিয়মিত ক্ষত
বেদনার বাঁকে, বুকে বিদ্ধ হয় আতরের তীর।

গোপনে গোপনে বলি তোমার সকাশে সেই কথা
আমাদের পৃথিবীতে প্রবৃত্তিরই পীড়িত প্রতাপ
নিরাময় চিনি নাই, সেকারণে সত্তাসংলগ্নতা
মনে হয় মরে গ্যাছে, এ ক্যামন নিরুপায় পাপ?
নিশুতি রাতের গন্ধে তুমি আমি ছাড়া আর কেউ
যদিও হাজির নাই, তবু দ্যাখো মানুষের ভিড়
আমার স্মৃতিতে তোলে ঝড়ভরা ত্রাণলোভী ঢেউ
আমরা বাঁচিতে চাই, ক্ষমা চাই, ফিরে চাই নীড়–

তোমার আপনতম নবীর গোপনতম ব্যথা
বেদনার চেতনার অগ্নি হয়ে ক'য়ে ওঠে কথা।

আমাদের প্রকাশিত বই

তাফ্সীরে মাযহারী (১–১২) মোট ১২ খণ্ড।
মাদারেজুন্ নবুওয়াত (১-৮) মোট ৮ খণ্ড
মাক্বামাতে মাযহারী (১-২) মোট ২ খণ্ড
মুকাশিফাতে আয়নিয়া
মাআরিফে লাদুন্নিয়া
মাব্দা ওয়া মা'আদ

মকতুবাতে মাসুমীয়া (১-৩) মোট ৩ খণ্ড
নকশায়ে নকশ্বন্দ ◆চেরাগে চিশ্তী ◆বায়ানুল বাকী
জীলান সূর্যের হাতছানি ◆নূরে সেরহিন্দ ◆কালিয়ারের কুতুব ◆প্রথম পরিবার
মহাপ্রেমিক মুসা ◆তুমিতো মোর্শেদ মহান ◆নবীনন্দিনী

আবার আসবেন তিনি
সুন্দর ইতিবৃত্ত ◆ফোরাতের তীর ◆মহাপ্লাবনের কাহিনী
দুজন বাদশাহ্ যাঁরা নবী ছিলেন ◆কী হয়েছিলো অবাধ্যদের

THE PATH
পথ পরিচিতি ◆নামাজের নিয়ম ◆রমজান মাস ◆ইসলামী বিশ্বাস
BASICS IN ISLAM ◆মালাবুদ্দা মিনহু

কাব্য সংকলন ◆সোনার শিকল
বিশ্বাসের বৃষ্টিচিহ্ন ◆সীমান্তপ্রহরী সব সরে যাও
তৃষিত তিথির অতিথি ◆ভেঙে পড়ে বাতাসের সিঁড়ি
নীড়ে তার নীল ঢেউ ◆ধীর সুর বিলম্বিত ব্যথা

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

জিকির সম্পর্কিত হাদিসসমূহ

তৃতীয় অধ্যায়

পর্যালোচনা ঃ এক

পর্যালোচনা ঃ দুই

পর্যালোচনা ঃ তিন

পর্যালোচনা ঃ চার

পর্যালোচনা ঃ পাঁচ

প্রথম অধ্যায়

'জিকির' অর্থ স্মরণ। 'জিকরুল্লাহ্' অর্থ আল্লাহ্র জিকির বা আল্লাহ্র স্মরণ। ইমান, ইসলাম, হেদায়েত ও দ্বীন-ধর্ম— শরীয়তের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে আল্লাহ্র জিকিরকে প্রতিষ্ঠিত করা। প্রথমে নিজেদের অন্তরে বাহিরে, পরে পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে— এভাবে সারা বিশ্বে।

কোরআনুল করীমও আল্লাহ্র জিকির। অর্থাৎ কোরআন আল্লাহ্র কথা মনে করিয়ে দেয়। আল্লাহ্পাক বলেছেন— 'ইন্না নাহ্নু নাজ্জালনাজ্ জিক্রা.......' (আমিই এই কোরআন অবতীর্ণ করেছি)— সুরা হিজর, আয়াত ৯। আবার কোথাও জ্ঞান অর্থেও জিকির শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন 'ফাসআলু আহলাজ্ জিকরা' (জ্ঞানীগণকে জিজ্ঞেস কোরো)— সুরা আম্বিয়া, আয়াত ৭।

এভাবে নামাজও আল্লাহ্র জিকির। কেননা নামাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য আল্লাহ্র জিকিরকে প্রতিষ্ঠা করা। যেমন বলা হয়েছে, 'আক্বিমিস্ সলাতা লি জিক্রি' (নামাজ প্রতিষ্ঠা করো আমার স্মরণের জন্য)— সুরা ত্বহা, আয়াত ১৪। এভাবে শরীয়তের সকল হুকুম আহকামের প্রতি যদি আমরা দৃষ্টিপাত করি, তবে দেখবো সকল আমলের মূল বা ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ্র জিকির। আল্লাহ্র জিকির ব্যতীত কোনো আমলই আল্লাহ্পাকের দরবারে গৃহীত হয় না। যেমন— হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, একাগ্রচিত্ততা (হুজুরী কলব) ছাড়া নামাজ হয় না। হুজুরী কলব অর্থ যে কলব নামাজে হাজির বা উপস্থিত থাকে। যে কলবে আল্লাহ্র জিকির থাকে, সেই কলবই তো হুজুরী কলব। কলবে আল্লাহ্র জিকির না থাকলে গাইরুল্লাহ্র জিকির থাকবে। আর গাইরুল্লাহ্র (আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর) স্মরণমগ্ন থাকলে নামাজ হবে কীভাবে।

সুতরাং বুঝতে হবে কলবে আল্লাহ্পাকের সার্বক্ষণিক জিকির থাকা ইবাদত বন্দেগী কবুল হওয়ার একটি শর্ত। বরং প্রধান শর্ত। তাই কোরআন মজীদের অনেক আয়াতে এ সম্পর্কে বিশেষভাবে হুকুম দেওয়া হয়েছে।

আমরা সেই সকল আয়াতের যথাযথ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ প্রথমে জেনে নেই। তারপর পরবর্তী আলোচনা-পর্যালোচনায় প্রবেশ করবো ইনশাআল্লাহু তায়ালা। উল্লেখ্য, এখানে আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হলো 'তাফসীরে মাযহারী' থেকে।

فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ -

(সুতরাং তোমরা শুধু আমাকেই স্মরণ কর, আমিও তোমাদিগকে স্মরণ করিব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং কৃতঘ্ন হইও না)— সুরা বাকারা আয়াত ১৫২।

ব্যাখ্যাঃ পরম তত্ত্বের (আল্লাহ্ সুবাহানাহু তায়ালার) পরিচিতি (মারেফাত) লাভ হয় অন্তরের বিবর্তন ও অলৌকিক প্রাপ্তির মাধ্যমে। অধিক জিকির ও মোরাক্বাবা ওই প্রাপ্তিকে নিশ্চিত করে। সেই জিকির ও মোরাক্বাবা সম্মিলিতভাবে হোক অথবা হোক এককভাবে। সেই জিকিরের প্রতি এই আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে এভাবে— 'ফাজকুরূনী (তোমরা শুধু আমাকেই স্মরণ করো)। এরপর বলা হয়েছে 'আজকুরকুম' (আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো)।

আবু শাইখ এবং দায়লামী 'মসনদে ফিরদাউস' গ্রন্থে জোবায়েরের মাধ্যমে তিনি জুহাকের মাধ্যমে এবং তিনি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রসুলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'ফাজকুরূনী আজকুরকুম' আয়াতের শানে এরশাদ করেছেন— আল্লাহ্পাক বলেন, হে বান্দাসকল! তোমরা আমাকে ইবাদতের মাধ্যমে স্মরণ করো। আমি মাগফিরাতসহ তোমাদেরকে স্মরণ করবো। অর্থাৎ তোমরা আমার ইবাদত করো— আমি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবো।

হজরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলে আকরম স. বলেছেন, আল্লাহ্পাক বলেন— আমার বান্দা আমার প্রতি যে ধারণা পোষণ করে, আমি তার সেই ধারণার অনুকূল। সে যখন আমাকে স্মরণ করে, তখন আমিও তাকে স্মরণ করি। সে যদি কোনো অনুষ্ঠানে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমিও তাকে স্মরণ করি অধিকতর উত্তম অনুষ্ঠানে। সে যদি আমাকে অন্তরে স্মরণ করে, তবে আমিও তাকে অন্তরে স্মরণ করি। সে যদি আমার দিকে অর্ধ হাত এগিয়ে আসে, তবে আমি এগিয়ে যাই একহাত। সে একহাত এলে আমি যাই দুই হাত। সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে, তবে আমি যাই দৌড়ে। বোখারী, মুসলিম। হজরত আনাস রা. থেকে বাগবীও এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনার সাথে এই উক্তিটিও রয়েছে যে, হজরত আনাস বলেছেন, নিজের পাঁচটি আঙ্গুল গণনা করার মতো স্পষ্টরূপে এই হাদিসটি আমি রসুলুল্লাহ্র কাছ থেকে শুনেছি।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. এরশাদ করেছেন, মানুষের অন্তর দ্বিকক্ষবিশিষ্ট। এক কক্ষে থাকে ফেরেশতা, অপর কক্ষে থাকে শয়তান। যখন মানুষ আল্লাহ্পাকের জিকির করে তখন শয়তান

তার কুঠুরী ছেড়ে পালিয়ে যায়। আর যখন জিকির থেকে অমনোযোগী হয়, তখন শয়তান তার ঠোঁট অন্তরে প্রবেশ করিয়ে কুমন্ত্রণা দেয়। ইবনে আবী শায়বা।

অমনোযোগিতা ও উদাসীনতা দূর করার নামই জিকির। জিকির না করার কারণেই অন্তর কঠিন হয়। উল্লেখ্য, শরীয়ত সমর্থিত কথা, কর্ম, চিন্তা-ভাবনা, অনুসন্ধিৎসা-গবেষণা— এ সকল কিছুই জিকিরের অন্তর্গত। তবে শর্ত হচ্ছে, এ সব কিছুই হতে হবে বিশুদ্ধ অন্তর সহযোগে। অসৎ উদ্দেশ্য ও অমনোযোগিতার সাথে সম্পাদিত আমল আল্লাহ্তায়ালার দরবারে গৃহীত হয় না। আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালা এরশাদ করেন—

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ - الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ -

(অবশ্যই সফলকাম হইয়াছে মু'মিনগণ, যাহারা বিনয়-নম্র নিজেদের সালাতে)। সুরা মু'মিনূন, আয়াত ১, ২।

আরো এরশাদ করেন—

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ - الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ -

(সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের, যাহারা তাহাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন)। সুরা মাউন, আয়াত ৪, ৫।

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ -

(যাহারা দাঁড়াইয়া, বসিয়া ও শুইয়া আল্লাহ্র স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে ও বলে, 'হে আমাদের প্রভুপালক! তুমি ইহা নিরর্থক সৃষ্টি কর নাই, তুমি পবিত্র, তুমি আমাদিগকে অগ্নিশাস্তি হইতে রক্ষা কর)। সুরা আলে ইমরান আয়াত ১৯১।

ব্যাখ্যাঃ যাঁরা প্রকৃত আলেম, তাঁরা দাঁড়িয়ে বসে শুয়ে— সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র জিকিরে মগ্ন থাকেন। জ্ঞানীগণের এটাই প্রধান বৈশিষ্ট্য। সার্বক্ষণিক জিকির, তসবীহ, ইস্তেগফার, দোয়া, বিনয়— ইমান ও জ্ঞানের পরিচয়। যারা এই বৈশিষ্ট্যাবলীমুক্ত, তারা চতুষ্পদ জন্তু অপেক্ষা নিকৃষ্ট। কেননা চতুষ্পদ জন্তুরাও তাদের নিজস্ব নিয়মে জিকিররত থাকে।

সাধারণ তাফসীরকারগণের অভিমত এই যে, সার্বক্ষণিক জিকিরের কথা বলা হয়েছে এই আয়াতে। কেননা মানুষ সকল সময় দাঁড়ানো, বসা অথবা শোয়া অবস্থাতেই থাকে। রসুলে পাক স. বলেছেন, যে ব্যক্তি জান্নাতের বাগানে পরিভ্রমণ করতে চায়, সে যেনো আল্লাহ্র জিকির অত্যধিক পরিমাণে করে। হাদিসটি হজরত মুয়াজ থেকে বর্ণনা করেছেন ইবনে আবী শায়বা এবং তিবরানী।

জিকির এর পরে এখানে বলা হয়েছে ফিকির (চিন্তা) এর কথা। বলা বাহুল্য, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে চিন্তা- ভাবনা করা ইবাদত। একে বলে 'তাফাক্কুর'। এই বিশাল রহস্যময় সৃষ্টি আল্লাহ্তায়ালার অপার ক্ষমতাকে নির্দেশ করে। তাঁর মহাপ্রজ্ঞা, মহাকৌশল এবং তাঁর অতুল এককত্বকে প্রমাণ করে। হজরত আলী রা. বলেছেন, রসুলে পাক স. এরশাদ করেছেন, তাফাক্কুরের মতো কোনো ইবাদত নেই।

হজরত আবু হোরায়রা রা. বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, এক ব্যক্তি রাতে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলো। তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো বিস্ময়ঘেরা নক্ষত্রমণ্ডলে। সে অভিভূত হলো এবং সাক্ষ্য দিলো, নিশ্চয়ই আমার প্রভুপালক সত্য। আমার স্রষ্টা সত্য। হে আমার আল্লাহ্! তুমি দয়া করে আমাকে মার্জনা করো। আল্লাহ্পাক তার প্রতি রহমত বর্ষণ করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন। আবু শায়েখ, ইবনে হাব্বান, সা'লাবী।

হাদিস শরীফে এসেছে, রসুলুল্লাহ্ স. সব সময় জিকিররত থাকতেন। এই জিকির হুসুলি নয়। হুজুরীও নয়। মুখের জিকির তো নয়ই। সার্বক্ষণিক মৌখিক জিকির অসম্ভব। অথচ সার্বক্ষণিক জিকিরই আসল জিকির। এই জিকিরের স্তর অতি উচ্চ। তাফাক্কুর বা ফিকিরই কেবল ওই মূল জিকিরের স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে। এ কারণেই আল্লাহ্পাক 'উলুল আলবাব্' বা বোধশক্তিসম্পন্নদের বৈশিষ্ট্যকে সার্বক্ষণিক জিকিরের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন এবং পরে উল্লেখ করেছেন চিন্তা-গবেষণার কথা। সঠিক চিন্তা-গবেষণা ওই জিকির পর্যন্ত পৌঁছুতে সহায়তা করে। ওই জিকির মূল প্রতিচ্ছায়াস্বরূপ, যা অক্ষয়, অব্যয়। তাই দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে জিকির করা অর্থ সর্বক্ষণ জিকির করা।

এখানে ফিকিরের পূর্বে জিকিরের উল্লেখ করা হয়েছে এজন্য যে, কেবল জ্ঞান বা চিন্তা-গবেষণা বিশুদ্ধ নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত প্রণয়নে সক্ষম নয়, যদি না সে জ্ঞান জিকিরের নূর এবং আল্লাহ্র পথপ্রদর্শন দ্বারা আলোকপ্রাপ্ত হয়। উল্লেখ্য ফিকিরের ভিত্তি জিকির এবং জিকিরের নূর। আল্লাহ্র জিকিরের নূর ব্যতিরেকে যারা চিন্তা-গবেষণায় লিপ্ত, তারা তাই পবিত্রতম সত্তা আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি বিশ্বাস থেকে বঞ্চিত। তারা প্রথিতযশা বিজ্ঞানী গবেষক, কিন্তু ইমানদার নয়।

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا -

(যখন তোমরা সালাত সমাপ্ত করিবে তখন দাঁড়াইয়া, বসিয়া এবং শুইয়া আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিবে, নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা বিশ্বাসীদের জন্য অবশ্য কর্তব্য)। সুরা নিসা, আয়াত ১০৩।

ব্যাখ্যাঃ দণ্ডায়মান অবস্থায়, উপবিষ্ট অবস্থায় এবং শায়িত অবস্থায় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার অর্থ প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহ্‌র স্মরণে রত থাকা। উম্মতজননী হজরত আয়শা সিদ্দিকা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুলুল্লাহ্ স. সব সময় আল্লাহ্‌র স্মরণে মগ্ন থাকতেন। আবু দাউদ। উল্লেখ্য, কোরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে, বিভিন্ন হাদিসে উল্লেখিত সার্বক্ষণিক জিকিরের উদ্দেশ্য কলবী জিকির। মুখে সর্বক্ষণ জিকির করা তো সম্ভবই নয়।

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۭ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ -

(তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রভুপালককে ডাক; তিনি যালিমদিগকে পছন্দ করেন না)। সুরা আ'রাফ, আয়াত ৫৫।

ব্যাখ্যাঃ এখানকার 'খুফ্ইয়াতান' শব্দটির অর্থ গোপন ইবাদত, যা বিশুদ্ধচিত্ততার সঙ্গে সম্পাদিত হয় এবং যা আত্মম্ভরিতা থেকে মুক্ত। উল্লেখ্য, আত্মম্ভরিতামুক্ত এবং শুদ্ধসংকল্পসম্বলিত না হলে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য কোনো ইবাদতই আল্লাহ্‌পাকের দরবারে গৃহীত হয় না।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালা এরশাদ করেন, আমি আমার বান্দার ধারণার অনুকূল। যদি সে আমাকে গোপনে (মনে মনে) স্মরণ করে, তবে আমিও তাকে স্মরণ করি গোপনে। যদি সে আমাকে দলবদ্ধভাবে স্মরণ করে, তবে আমিও তাকে স্মরণ করি পবিত্র ও মর্যাদাশালী দলের মধ্যে (ফেরেশতাদের সঙ্গে)। বোখারী, মুসলিম। এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয় প্রকার জিকির সিদ্ধ। কেউ কেউ বলেছেন, এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়, প্রকাশ্য ও সশব্দ জিকিরই উত্তম। কিন্তু কথাটি ঠিক নয়। বরং এখানে একথাই প্রমাণিত হয় যে, নীরব ও সরব উভয় প্রকার জিকির গ্রহণীয়। বরং এখানে নীরব স্মরণকে সরব স্মরণাপেক্ষা প্রাধান্য প্রদান করা হয়েছে। এক আয়াতে এসেছে—

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا -

(অতঃপর যখন তোমরা হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করিবে তখন আল্লাহ্কে এমনভাবে স্মরণ করিবে যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষগণকে স্মরণ করিতে, অথবা তদপেক্ষা অভিনিবেশ সহকারে)। সুরা বাকারা, আয়াত ২০০। এখানে সরব জিকিরের কথা বলা হয়নি। বলা হয়েছে অত্যধিক জিকিরের কথা।

আলেমগণের ঐকমত্য এই যে, গোপন জিকিরই উত্তম এবং অতি উচ্চস্বরে জিকির বেদাত। তবে কোনো কোনো উচ্চস্বরে জিকির অত্যাবশ্যক। যেমন— আজান, ইক্বামত, তক্বীর, তাশরীক ইত্যাদি। এ ছাড়া নামাজে ইমামের অজুভঙ্গ হলে তাঁকে উচ্চস্বরে তক্বীর বলতে হয়। মোক্তাদির অজু ভঙ্গ হলে তাকে উচ্চস্বরে 'সুবহানাল্লাহ্' বলে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যেতে হয়। হজ্বের সময় উচ্চস্বরে বলতে হয় লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক......ইত্যাদি।

নিম্নস্বরের জিকির অথবা গোপন জিকিরই প্রকৃত জিকির। অতি উচ্চস্বরে জিকির করা বেদাত। একথাটিও প্রণিধাননীয় যে, সরবতা ও নীরবতার মধ্যে যেহেতু দৃশ্যত দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে, সেহেতু নীরবতাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য হওয়াই সমীচীন। তাই গোপন জিকিরই (জিক্‌রে খফি) উত্তম। সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়ীগণের ঐকমত্য ছিলো নীরব জিকিরের পক্ষে।

হাসান বসরী র. বলেছেন, উচ্চস্বরের দোয়া ও নিম্নস্বরের দোয়ার মধ্যে সত্তর হাজার গুণ পার্থক্য রয়েছে। প্রথম যুগের মুসলমানগণ দীর্ঘ সময় ধরে দোয়া করতেন। তাঁদের ওই দোয়ার সামান্য আওয়াজও শোনা যেতো না। শুধু শোনা যেতো ওষ্ঠ সঞ্চালনের শব্দ। কেননা আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেছেন—

أُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً -

(তোমরা বিনীতভাবে এবং গোপনে তোমাদের প্রভুপালককে ডাক)। সুরা আ'রাফ, আয়াত ৫৫। নবী জাকারিয়া সম্পর্কে অন্যত্র এরশাদ করেছেন—

إِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا -

(যখন সে তাহার প্রভুপালককে আহবান করিয়াছিল নিভৃতে)। সুরা মার্‌য়াম, আয়াত ৩।

হজরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, উত্তম জিকির হচ্ছে জিকরে খফি (নীরব জিকির) এবং উত্তম জীবিকা হচ্ছে ওই জীবিকা, যা ন্যূনতম সামর্থ্যের অন্তর্ভূত। আহ্মদ, ইবনে হাব্বান, বায়হাকী।

হজরত আবু মুসা আশআরী বর্ণনা করেছেন, খয়বর যুদ্ধের সময় একটি প্রান্তর অতিক্রমকালে মুসলিম সৈন্যরা উচ্চস্বরে তক্বীর উচ্চারণ করেছিলেন।

রসুলেপাক স. তখন বলেছিলেন, শান্ত হও। তোমরা কোনো অনুপস্থিত সত্তাকে তো আহবান করছো না— তোমরা ওই সত্তাকে ডাকছো, যিনি সর্বশ্রোতা এবং নিকটতম।

আমি বলি, বাগবী বর্ণিত এই হাদিসটির মাধ্যমে জিক্‌রে খফির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। কিন্তু এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, রসুলেপাক স. এখানে উচ্চস্বরে তক্‌বীর ধ্বনিকে নিষিদ্ধ করেননি। বলেছেন, শান্ত হও। তাই এই হাদিসের মাধ্যমে জিক্‌রে খফির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হওয়ার সাথে সাথে একথাও প্রমাণিত হয় যে, নীরব ও সরব উভয় প্রকার জিকির সিদ্ধ।

জিকির তিন প্রকার—

১. চিৎকার করে জিকির করা। আলেমগণের ঐকমত্যানুসারে এরকম জিকির সকল অবস্থায় মাকরুহ্। তবে বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে যদি অধিকতর উপকার পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, পরিস্থিতিগত কারণে আলেমগণ যদি সাময়িকভাবে এরকম জিকিরকে কল্যাণময় মনে করেন, তবে তাকে অসিদ্ধ বলা যাবে না। বরং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অত্যুচ্চ আওয়াজে জিকির করাই উত্তম। যেমন— আজান, হজ্বের তালবিয়া ইত্যাদি। চিশতিয়া তরিকার কোনো কোনো পীর ও মোর্শেদ প্রাথমিক অবস্থায় মুরিদগণকে উচ্চস্বরে জিকির করতে বলেন। শয়তান বিতাড়ন, আলস্য দূরীকরণ, ঔদাসীন্য অপসারণ, অন্তর উত্তপ্তকরণ, অনুপ্রেরণা ও অনুরাগের উজ্জীবন ইত্যাদির উদ্দেশ্যে চিশতিয়া তরিকার পীরগণ প্রাথমিক সালেকদের জন্য এরকম জিকির নির্ধারণ করে দেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আত্মপ্রসাদ এবং যশলাভের উদ্দেশ্যে অত্যুচ্চ আওয়াজে জিকির করা থেকে বিরত থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

২. রসনা সঞ্চালনের মাধ্যমে অত্যন্ত অনুচ্চ আওয়াজে জিকির করা। রসুলেপাক স. বলেছেন, সকল সময় আল্লাহ্‌র জিকিরে তোমরা রসনাকে সিক্ত রাখো। ইমাম আহ্‌মদ ও তিরমিজির বর্ণনায় রয়েছে, একবার রসুলুল্লাহ্ স.কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রসুল! সর্বাপেক্ষা উত্তম আমল কোনটি? তিনি স. বললেন, পৃথিবী পরিত্যাগের সময় আল্লাহ্‌র জিকির দ্বারা রসনাকে সরস রাখা।

৩. জিহ্বা সঞ্চালন ব্যতীত কেবল কলব, রূহ ও নফস দ্বারা গোপনে জিকির করা। এই জিকিরকে বলে জিক্‌রে খফি। আমল লেখক ফেরেশতারা এই জিকির সম্পর্কে অজ্ঞাত।

উম্মতজননী হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. থেকে আবু ইয়ালী বর্ণনা করেছেন, রসুল স. বলেছেন, সরব জিকির অপেক্ষা নীরব জিকির সত্তর হাজার গুণ অধিক মর্যাদাপূর্ণ। শেষ বিচারের দিন ফেরেশতারা যখন মানুষের আমলনামা উপস্থিত করবে, তখন আল্লাহ্‌পাক এক লোককে দেখিয়ে বলবেন, ভালো করে দ্যাখো

আমার এই বান্দার কোনো পাপ পুণ্য লেখা বাদ পড়লো কিনা! ফেরেশতারা বলবে, আমরা যা কিছু জেনেছি, শুনেছি ও দেখেছি— সবকিছুই আমলনামায় লিখে নিয়েছি। কোনো কিছুই পরিত্যাগ করিনি। আল্লাহ্তায়ালা বলবেন, আমার এই বান্দার গোপন আমলও রয়েছে, যার কথা তোমরা জানো না। সেই আমল হচ্ছে জিক্‌রে খফি।

আমি বলি, এই জিক্‌রে খফি বা কলবী জিকিরের ধারাবাহিকতা কখনো ছিন্ন হয় না। শারীরিক ক্লান্তি, শ্রান্তি ও আলস্য গোপন জিকিরের প্রতিবন্ধক নয়। জিকিরে জাগ্রত কলবে তাই প্রতিটি মুহূর্তে চলতে থাকে আল্লাহ্‌র জিকির।

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّ خِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ -

(তোমার প্রভুপালককে মনে মনে সবিনয় ও সশংকচিত্তে অনুচ্চস্বরে প্রত্যূষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ করিবে এবং তুমি উদাসীন হইবে না) সুরা আ'রাফ, আয়াত ২০৫।

ব্যাখ্যাঃ হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, এই আয়াতে নামাজের ক্বেরাতের উচ্চারণসীমা নির্দেশ করা হয়েছে। 'ওয়াজকুর রব্বাকা ফি নাফসিকা' কথাটির মধ্যে উল্লেখিত 'জিকির' অর্থ নামাজের ক্বেরাত অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে নামাজের মধ্যে গোপনে, মনে মনে (জিহ্বা সঞ্চালনসহ) ক্বেরাত পাঠ করবে। 'ওয়া দুনাল জাহ্‌রি মিনাল ক্বওলি'— এখানে আল জাহ্‌রি অর্থ প্রকাশ্য নামাজ (যে নামাজে সশব্দে ক্বেরাত পাঠ করতে হয়)। দুনাল জাহ্‌রি অর্থ অনুচ্চস্বরে। অর্থাৎ সুউচ্চ স্বরের চেয়ে কম আওয়াজে এবং নিঃশব্দ আওয়াজের চেয়ে কিছুটা উচ্চস্বরে। এরকম বলার উদ্দেশ্য এই যে— যে নামাজগুলোতে উচ্চস্বরে ক্বেরাত পাঠের বিধান আছে (মাগরিব, এশা, ফজর) সে নামাজগুলোতে অত্যন্ত স্পষ্ট উচ্চারণে কোরআন পাঠ কোরো, অতিরিক্ত চিৎকার কোরো না। বরং এমন শান্তভাবে মধুর স্বরে পড়ো, যেনো পশ্চাতের ব্যক্তিদের শুনতে কোনো অসুবিধা না হয়।

মুজাহিদ বলেছেন, জিকির করবে অন্তরে অন্তরে। এটাই এই আয়াতের বক্তব্য। প্রার্থনার মধ্যে থাকতে হবে বিনয় ও শংকা। উচ্চকণ্ঠ হবে না। চিৎকার করে আল্লাহ্‌কে ডাকবে না। মনে মনে দোয়া করলে হৃদয়ের বিশুদ্ধতা বৃদ্ধি পায়।

আমি বলি, এখানে অনুচ্চস্বরে এবং মনে মনে কথা দুটোর মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক সংযোগ। কথা দুটোর মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে জিক্‌রে জেহরী (অনুচ্চস্বরে জিকির) এবং জিক্‌রে খফিকে (মনে মনে জিকিরকে)।

'বিলগুদুব্যি' অর্থ প্রত্যুষে, সকালে। আর 'ওয়াল্ আস্‌লি' অর্থ দিবসের শেষভাগ, সন্ধ্যা। সকাল ও সন্ধ্যা এ দুটো সময় যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। তাই এই দুই সময়ে বিশেষভাবে জিকিরে নিমগ্ন থাকতে বলা হয়েছে। নতুবা জিকির তো করতে

হবে সর্বক্ষণ। তাই শেষে বলা হয়েছে 'ওয়ালা তাকুম্ মিনাল্ গফিলীন' (এবং তুমি উদাসীন হয়ো না)। একথার অর্থ কোনো সময়ই আল্লাহ্র জিকির থেকে অমনোযোগী থেকো না।

আমি বলি, আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে 'ওয়াজকুর্ রব্বাকা ফি নাফসিকা'। পরে বলা হয়েছে, 'বিল গুদুব্বি ওয়াল আস্‌লি ওয়ালা তাকুম্ মিনাল্ গফিলীন'। এই বিবরণভঙ্গির মাধ্যমে এখানে জিকির বলে সব রকম জিকিরকেই বুঝানো হয়েছে। কোরআন পাঠসহ সকল জিকিরই এই নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্র স্মরণের বিষয়ে উদাসীনতা বা অমনোযোগিতা দূর করাই এখানে প্রধান উদ্দেশ্য, যে কোনো ধরনের জিকিরের মাধ্যমে তা করা হোক না কেনো।

একটি প্রশ্নঃ আল্লাহ্র জিকির ও দোয়ায় উচ্চকণ্ঠ হওয়া বেদাত। নিঃশব্দে এবং অনুচ্চস্বরে জিকির করা এবং দোয়া করা সুন্নত। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে জিকিরের আলোচনা সূত্রে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে ক্বেরাতের। তাহলে ক্বেরাত ও জিকিরের মধ্যে পার্থক্য কী? ক্বেরাতও তো জিকির— নয় কি?

উত্তরঃ কোরআনের মধ্যে রয়েছে অনেক উপদেশ, অনেক শিক্ষণীয় ঘটনা এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিধান। কোরআনের বিবরণ ও ব্যঞ্জনা হৃদয়গ্রাহী, মাধুর্যমণ্ডিত এবং প্রাঞ্জল। এই বৈশিষ্ট্যগুলো জিকির অপেক্ষা অতিরিক্ত। জিকিরের মাধ্যমে অন্তরের ঔদাসীন্য দূর হয়। জিকির স্বয়ং একটি ইবাদত। কিন্তু এর মধ্যে অন্যকে শোনানোর মতো কিছু নেই, যেরকম রয়েছে কোরআনে। আর কবুল হওয়া না হওয়াই দোয়ার বৈশিষ্ট্য। সুতরাং এর মধ্যেও অন্যকে জানানোর মতো কিছু নেই। তাই নীরব জিকির ও দোয়া সর্বোত্তম। নীরব জিকিরের গতি মগ্নতার দিকে। জিকিরে মগ্ন ব্যক্তির স্মৃতিপটে কেবল আল্লাহ্ই সমুদ্ভাসিত থাকেন। এভাবেই তার লাভ হয় ফানা ফিল্লাহ্। এ সকল বৈশিষ্ট্য আবার ক্বেরাতের মধ্যে নেই।

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ -

(মু'মিন তো তাহারাই যাহাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা হয় এবং যখন তাঁহার আয়াত তাহাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন উহা তাহাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তাহারা তাহাদের প্রভুপালকের উপরই নির্ভর করে)। সুরা আনফাল, আয়াত ২।

ব্যাখ্যাঃ 'বিশ্বাসী তো তারাই, যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহ্র স্মরণ করা হয়' এ কথার অর্থ— ওই সকল লোকই পরিপূর্ণ বিশ্বাসী যাদের অন্তর

(কলব) আল্লাহ্তায়ালার অতুলনীয় মহিমা, গৌরব ও পরাক্রম স্মরণ করে ভীত হয়। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে ওই সকল লোকের কথা বুঝানো হয়েছে, যারা কোনো পাপ কর্মের ইচ্ছা করলে তাদেরকে যদি বলা হয় 'আল্লাহ্কে ভয় করো' তবে তারা আল্লাহ্র আযাবের ভয়ে তৎক্ষণাৎ সেই পাপকর্মের চিন্তা পরিত্যাগ করে। এই ব্যাখ্যার আলোকে এখানে 'আল্লাহ্র স্মরণ' অর্থ হবে— আল্লাহ্র আযাবের স্মরণ।

এরপর বলা হয়েছে— এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রভুপালকের উপরেই বিশ্বাস করে। একথার অর্থ— যখন ওই সকল ব্যক্তির সামনে কোরআন পাঠ করা হয়, তখন তাদের প্রতি বর্ষিত হয় অজস্র বরকত। তাদের চোখে ও হৃদয়ে সমুদ্ভাসিত হতে থাকে আল্লাহ্তায়ালার অনেক বিস্ময়কর নিদর্শন। ফলে তাদের বিশ্বাস হয় অধিকতর দৃঢ়বদ্ধ। তারা তখন সকল অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হয়ে পড়েন কেবল আল্লাহ্র উপর। অন্যের উপর তারা যেমন নির্ভর করেন না, তেমনি অন্য কাউকে ভয়ও পান না। তাদের যাবতীয় কার্যকলাপ সমর্পিত হয় আল্লাহ্র প্রতি।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ۗ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ -

(যাহারা বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ্র স্মরণে যাহাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়; জানিয়া রাখ, আল্লাহ্র স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়)। সুরা রা'দ, আয়াত ২৮।

ব্যাখ্যাঃ 'যারা বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ্র স্মরণে যাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়' একথার অর্থ— আল্লাহ্ অভিমুখী যারা, তাদের চিত্তে (কলবে) বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ হয়। সকল সন্দেহের অবসান ঘটে এবং আল্লাহ্র স্মরণে তাদের হৃদয় হয় পরিতৃপ্ত । এখানে 'জিকির' অর্থ কোরআন মজিদ এবং 'ইত্মিনান' অর্থ ইমান। উল্লেখ্য, অপবিত্রতা ও অপবিশ্বাস হচ্ছে হৃদয়ের অস্বস্তি ও চাঞ্চল্য। আর হৃদয়ের প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তি হচ্ছে ইমান। অথবা আল্লাহ্র স্মরণে চিত্ত প্রশান্ত হয় কথাটির অর্থ হবে আল্লাহ্র জিকির দ্বারা হৃদয় থেকে দূরীভূত হয় শয়তানের প্ররোচনা। এমতাবস্থায় জিকিরের অর্থ হবে আল্লাহ্র স্মরণ।

রসুলেপাক স. বলেছেন, মানুষের অন্তঃকরণে (কলবে) রয়েছে দুটি প্রকোষ্ঠ। একটিতে থাকে ফেরেশতা এবং অপরটিতে থাকে শয়তান। অন্তরে জিকির উত্থিত হলে শয়তান পালিয়ে যায়। আর জিকির না থাকলে শয়তান কলবে অনুপ্রবেশ করিয়ে দেয় তার চিন্তা। এভাবেই সে মানুষকে প্ররোচিত করে।

'মুনসিফ' গ্রন্থে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে শায়বা এবং হজরত ইবনে আব্বাস থেকে মারফুরূপে প্রলম্বিত সূত্র সহযোগে বর্ণনা করেছেন বোখারী।

হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এসেছে, শয়তান দলিত মথিত করতে থাকে মানুষের অন্তর। সে যখন জিকিরে রত হয়, তখন শয়তান পশ্চাদপসরণ করে, আর অমনোযোগী হলে অন্তরে ঢেলে দেয় কুমন্ত্রণা।

আলোচ্য বাক্যের মর্ম এরকমও হতে পারে যে, আল্লাহ্‌র জিকিরে চিত্ত প্রশান্ত হয়— যেমন সলিলাভ্যন্তরে প্রশান্তি লাভ করে মৎস্য, উন্মুক্ত আকাশে বিহঙ্গ এবং অরণ্যে অরণ্যবাসীরা। পক্ষান্তরে জিকির বিস্মৃত অন্তরে সৃষ্টি হয় অশান্তি, যেমন অশান্তি ভোগ করে পানির সাথে সম্পর্কচ্যুত মাছ। পানিতে নিমজ্জিত স্থলচর প্রাণী এবং পিঞ্জিরায় আবদ্ধ পাখি। এই বিষয়টি সুফী সাধকগণের অনুসারীদের নিকটে দিবালোকের মতো স্পষ্ট। সত্যনিষ্ঠ পীর-মোর্শেদগণের খানকায় গমনকারীরা এর প্রত্যক্ষদর্শী। অতএব এখানে 'যারা বিশ্বাস করে' কথাটির মর্মার্থ হবে— ওই সকল সুফী দরবেশ, যাদের অন্তর পবিত্র ও জিকিরময়।

'জেনে রেখো, আল্লাহ্‌র স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়' কথাটির অর্থ— পবিত্র হৃদয় বিশিষ্ট যাঁরা, তাঁদের চিত্ত প্রশান্ত হয় আল্লাহ্‌র স্মরণে। এ সম্পর্কে একটি সন্দেহ ও তার নিরসনের উল্লেখ করেছেন বাগবী। সন্দেহটি এরকম— এক আয়াতে (সুরা আনফাল, আয়াত ২) বলা হয়েছে 'বিশ্বাসবান তারাই, আল্লাহ্‌র জিকির করা হলে যাদের হৃদয় আল্লাহ্‌র ভয়ে কম্পমান হয়'। আর এখানে বলা হলো 'আল্লাহ্‌র স্মরণে যাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়' এখন প্রশ্ন হলো ভয় ও প্রশান্তির সহঅবস্থান কি সম্ভব? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে, শাস্তির বিষয় উল্লেখ করা হলে বিশ্বাসীদের অন্তরে জেগে ওঠে শংকা। আর আল্লাহ্‌র অপার করুণা ও ক্ষমার কথা মনে হলে অন্তরে আগমন করে প্রশান্তি। ভয় ও প্রশান্তি পরস্পরবিরোধী দুটো বিষয়। তাই এ দুটো একই সঙ্গে হৃদয়ে অবস্থান করতে পারে না। একটি এলে অপরটি অপসারিত হয়। আমি বলি, প্রশান্তি ও ভীতির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো বৈপরীত্য নেই। প্রশান্তি সৃষ্টি হয় 'উনস' বা অনুরাগ থেকে। আর অনুরাগ বর্তমান থাকে ভয়ের সময়েও। এভাবে একই সঙ্গে হৃদয়ে সঞ্চারিত হতে থাকে ভয় ও আশা।

হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, অন্তিম যাত্রা কালে এক যুবকের শয্যাপাশে উপস্থিত হলেন রসুলেপাক স.। বললেন, তোমার মনের অবস্থা এখন কেমন? যুবক বললো, আমি আল্লাহ্‌র ক্ষমার আশা রাখি আবার তাঁর ভয়ে আমি ভীতও। তিনি স. বললেন, পৃথিবী পরিত্যাগের প্রাক্কালে যার অন্তরের অবস্থা এরূপ হয়,

আল্লাহ্ তাকে দান করেন তার কাম্যবস্তু এবং রক্ষা করেন ভয়ভীতি থেকে। তিরমিজি, ইবনে মাজা।

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ إِذَا نَسِيْتَ -

(যদি ভুলিয়া যাও, তবে তোমার প্রভুপালককে স্মরণ করিও)। সুরা কাহ্ফ, আয়াত ২৪ ।

ব্যাখ্যাঃ কথাটির অর্থ— হে আমার রসুল! আপনি যদি ইনশাআল্লাহ্ বলা ছাড়া কোনো কথা বা কাজের ঘোষণা দেন, তবে আল্লাহ্তায়ালার প্রশংসা বর্ণনা ও ক্ষমাপ্রার্থনার মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করবেন। অথবা এমতো অনবধানতার কারণে আল্লাহ্র বিরাগভাজনতার কথা স্মরণ করে অনুতপ্ত হবেন। কিংবা এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ্কে স্মরণ করবেন, যেনো তিনি আপনার বিস্মৃতিপ্রবণতাকে দূর করে দেন এবং আপনার স্মরণশক্তিকে করে দেন প্রখর।

ইকরামা বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে এই মর্মে সদুপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যখন তোমরা রাগান্বিত হও তখন আল্লাহ্কে স্মরণ কোরো। ওয়াহাব বর্ণনা করেছেন, ইঞ্জিল শরীফে উল্লেখিত হয়েছে, হে আদম সন্তান! তোমরা রাগান্বিত হলে আমাকে স্মরণ কোরো (তাহলে রাগ কমে যাবে)। এরকম যদি করো, তবে আমার রোষতপ্ত অবস্থায়ও আমি তোমাদের স্মরণ করবো (ক্ষমা করবো তোমাদের অপারগতাকে)।

জুহাক ও সুদ্দী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের নির্দেশনাটি নামাজের হুকুমের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে— নামাজের মধ্যে যদি তোমরা কোনো করণীয় আমলের কথা ভুলে যাও, তবে আল্লাহ্কে স্মরণ কোরো। কথাটির অর্থ এরকমও হতে পারে যে— নামাজ পাঠের কথা যদি তোমরা ভুলে যাও, তবে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে নামাজ আদায় করে নিও। হজরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. আজ্ঞা করেছেন, যে ব্যক্তি নামাজ পড়তে ভুলে যায়, সে যেনো স্মরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা আদায় করে নেয়। বাগবী, বোখারী, মুসলিম, আহ্মদ, তিরমিজি। নাসাঈর বর্ণনায় বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে এভাবে— বিস্মৃতি অথবা নিদ্রার কারণে যদি কারো নামাজ যথাসময়ে পঠিত না হয়, তবে তার কর্তব্য হবে, স্মরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে তার বাদ পড়ে যাওয়া নামাজ আদায় করে নেবে।

সুফিয়ানে কেরাম আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে এক সারগর্ভ আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। তাঁদের মতে এই আয়াতের মর্মার্থ এরূপ— যখন তোমরা আল্লাহ্কে ছেড়ে অন্য কিছুর স্মরণে লিপ্ত হও, তখন আল্লাহ্র কথা স্মরণ কোরো

বিশুদ্ধ অন্তরে। তাঁরা আরো বলেন, গাইরুল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে পরিপূর্ণরূপে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বিশুদ্ধ হৃদয়ে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা যায় না। কারণ মানুষের কলব একটিই। সুতরাং একথা কিছুতেই বলা যায় না যে, কলবে একই সঙ্গে জাগ্রত থাকবে আল্লাহ্‌ এবং গাইরুল্লাহ্‌র (আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য সকলকিছুর) স্মরণ। কলবকে যদি আল্লাহ্‌র ভালোবাসায় পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করা যায় তাহলে নিশ্বাস-প্রশ্বাসও রঞ্জিত হবে আল্লাহ্‌র ভালোবাসায় ও স্মরণে। এই অবস্থার নাম ফানায়ে কলব (কলবের অস্তিত্ববিস্মৃতি)। এই ফানায়ে কলব অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সুফিয়ানে কেরাম কাউকে তওহীদপন্থী বা এক আল্লাহ্‌য় বিশ্বাস স্থাপনকারী মনে করেন না। আমি বলি, সুফিয়ানে কেরামের ব্যাখ্যাই কোরআন মজীদের স্পষ্ট বর্ণনা, আরবী ব্যাকরণ এবং অভিধানের অনুকূল। দেখুন, এখানে প্রথমে বলা হয়েছে 'যদি ভুলে যাও'। তারপর বলা হয়েছে 'তোমার প্রভুপালককে স্মরণ কোরো'। এভাবে এখানে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, বিস্মরণ ও স্মরণ (গাফলত ও জিকির) বিপরীতধর্মী দুটি বিষয়। এ দুটোর একত্রায়ণ সম্ভবই নয়। সুতরাং এ দুটো ক্রিয়ার একটিকে প্রত্যক্ষ অর্থে, আর একটিকে পরোক্ষ অর্থে গ্রহণ করতে হবে, যেনো কোনো অযথার্থ অর্থ গ্রহণ না করতে হয়। অতএব একথা মানতেই হবে যে, এক্ষেত্রে সুফিয়ানে কেরামের বক্তব্য সঠিক ও বাস্তবোচিত।

وَ لَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَ كَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا -

(তুমি তাহার আনুগত্য করিও না— যাহার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করিয়া দিয়াছি, যে তাহার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও যাহার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে)। সুরা কাহ্‌ফ। আয়াত ২৮।

ব্যাখ্যাঃ বাগবী লিখেছেন, আলোচ্য বাক্যে দেওয়া হয়েছে উয়াইনার বিবরণ। বলা হয়েছে— হে আমার রসুল! আমি উয়াইনার কলবকে আমার জিকির থেকে বঞ্চিত করেছি। সে তার প্রবৃত্তিজাত খেয়ালের অনুসারী এবং তার কার্যকলাপ সীমালংঘনের দায়ে দুষ্ট। অতএব তার কথায় আকৃষ্ট হবেন না। কিন্তু ইবনে মারদুবিয়া ও জুহাকের বর্ণনায় এসেছে, আলোচ্য বাক্যে বলা হয়েছে উমাইয়া বিন খালফ্‌ জামুহীর কথা। সে একবার রসুলুল্লাহ্‌ স. কে বলেছিলো, মোহাম্মদ! তোমার দরিদ্র সহচরদের দূর করে দিয়ে তদস্থলে মক্কার নেতৃবৃন্দকে তোমার কাছে বসতে দাও। বলা বাহুল্য, তার এরকম গর্হিত বক্তব্য আল্লাহ্‌পাক পছন্দ করেননি। সে কথাই জানিয়ে দিয়েছেন এই আয়াতে।

ইবনে বুরাইদার বর্ণনায় এসেছে, একবার রসুলুল্লাহ্‌র মহান সান্নিধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন হজরত সালমান ফারসী রা.। এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলো উয়াইনা। বললো, আমরা অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা আপনার কাছে বসতে চাই। তাই বলি, ওই অনভিজাতদেরকে তাড়িয়ে দিন। তখন অবতীর্ণ হলো 'যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি....'। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, অভিজাত নেতৃবৃন্দের আবেদন প্রত্যাখ্যান করতে বলা হয়েছে দু'টি কারণে— ১. তাদের কলবে আল্লাহ্‌র জিকির নেই। ২. তারা অনুসরণ করে তাদের নফসের খেয়ালখুশীর।

উল্লেখ্য, পার্থিব প্রতাপ এবং বংশমর্যাদার অহংকার দূর না করা পর্যন্ত আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রসুলের নৈকট্য লাভ করা যায় না। সুতরাং যাদের কলব আল্লাহ্‌র জিকির থেকে গাফেল এবং যারা নফসের অনুসারী তাদের অনুসরণ নিষিদ্ধ। (তারা আলেম, ফাজেল, নেতা, মন্ত্রী যেই হোক না কেনো)।

رِجَالٌ ۙ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّ لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَ اِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ ۙۖ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَ الْاَبْصَارُ -

(সেই সব লোক, যাহাদিগকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্‌র স্মরণ হইতে এবং সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান হইতে বিরত রাখে না, তাহারা ভয় করে সেই দিনকে যেই দিন অনেক অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হইয়া পড়িবে)। সুরা নূর, আয়াত ৩৭।

ব্যাখ্যাঃ 'জিকরিল্লাহ্‌' (আল্লাহ্‌র স্মরণ) অর্থ এখানে নামাজ পাঠের উদ্দেশ্যে মসজিদে গমন। সালেম সূত্রে বাগবী লিখেছেন, হজরত ইবনে ওমর রা. বলেছেন, একবার আমি ছিলাম বাজারে। এমন সময় নামাজের ইকামত শুরু হলো। বাজারের লোকজন দোকানপাট বন্ধ করে শামিল হলো নামাজের জামাতে। তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াত।

অথবা এখানে 'জিকরিল্লাহ্‌' অর্থ আল্লাহ্‌র সার্বক্ষণিক জিকির। এভাবে 'জিকির' শব্দটি হবে ব্যাপক অর্থবোধক। যাঁরা সারাক্ষণ আল্লাহ্‌র ইবাদতে মগ্ন থাকেন, তাঁরা সকলেই হবেন এর অন্তর্ভুক্ত। অন্তর্ভুক্ত হবেন তাঁরাও, যাঁরা জাগতিক কাজকর্ম পরিহার করেন না বটে, কিন্তু যাঁদের অন্তর থাকে সতত স্মরণমুখর। ব্যবসা-বাণিজ্য ও পার্থিব দায়িত্ব যাঁদের অন্তরকে আল্লাহ্‌র স্মরণচ্যুত

করতে পারে না। অর্থাৎ তাঁদের বাহির পৃথিবীর প্রয়োজনসমূহের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু অন্তর সংযুক্ত আল্লাহ্‌র জিকিরের সঙ্গে।

উল্লেখ্য, এই আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করেই ইমামুত্ তরিকত্ হজরত বাহাউদ্দিন নকশ্‌বন্দ র. বলেছেন, এই তরিকার (নকশ্‌বন্দিয়া) বিশেষত্ব এই যে, একই সঙ্গে মানুষের 'জাহের' দুনিয়ার সঙ্গে এবং বাতেন আল্লাহ্‌পাকের স্মরণে মশগুল থাকে।

اُتْلُ مَآ اُوْحِیَ اِلَیْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ وَاللّٰهُ یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ -

(তুমি আবৃত্তি কর কিতাব হইতে যাহা তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়। এবং সালাত কায়েম কর। সালাত অবশ্যই বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কার্য হইতে। আর আল্লাহ্‌র স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা জানেন)। সুরা আনকাবুত, আয়াত ৪৫।

ব্যাখ্যাঃ 'আল্লাহ্‌র স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ' কথাটির গুরুত্ব অপরিসীম। এরকম মন্তব্য করেছেন ইবনে আতা। কোনো পাপই জিকিরের সম্মুখে তিষ্ঠাতে পারে না। আর এখানে 'জিকরুল্লাহ্' অর্থ ওই নামাজ, যা পাপপ্রতিরোধক। নামাজ সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত। তাই এখানে নামাজকেই সরাসরি বলা হয়েছে 'জিকরুল্লাহ্'।

জিকিরের মাহাত্ম্যঃ জিকিরের মহিমা-মাহাত্ম্য সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে অনেক হাদিস। তন্মধ্যে কিছুসংখ্যকের উল্লেখ করা হলো এখানে এভাবে—

হজরত আবু দারদা রা. বর্ণনা করেছেন, একবার রসুলেপাক স. উপস্থিত সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন আমলের কথা জানাবো না, যা তোমাদের কর্তা-বিধাতার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়, পবিত্র ও সর্বোত্তম। যা আল্লাহ্‌র পথে স্বর্ণ-রৌপ্য দান করা অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ? এমনকি অধিক পুণ্যার্জক রণক্ষেত্রে শত্রুনিধনের চেয়েও? সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক! অবশ্যই দয়া করে বলুন। তিনি স. বললেন, তা হলো আল্লাহ্‌র জিকির। আহ্‌মদ, মালেক, তিরমিজি, ইবনে মাজা।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বর্ণনা করেছেন, আমি একবার রসুলে করীম স.কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র প্রিয়তম বাণীবাহক! আল্লাহ্‌র দাসগণের মধ্যে তাঁর নিকট কে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন? তিনি স. বললেন, যে আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ

করে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ধর্মযোদ্ধার চেয়েও কি? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ, যদিও সেই ধর্মযোদ্ধা যুদ্ধ করতে করতে তার তরবারী ভেঙে ফেলে এবং রক্তাক্ত হয়। আহ্মদ, তিরমিজি।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে বিশর রা. বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি একবার রসুলে আকরম স. সকাশে হাজির হয়ে বললো, হে দয়াল নবী! কোন্ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী সৌভাগ্যবান? তিনি স. বললেন, যার আয়ুষ্কাল দীর্ঘ ও পুণ্যকর্মশোভিত। লোকটি জানতে চাইলো, সর্বাধিক নন্দিত কর্ম কোনটি? তিনি স. বললেন, ওই জিকির, যা অন্তিমযাত্রার প্রাক্কালে সিক্ত করে রাখে রসনা। আহ্মদ, তিরমিজি।

হজরত আবু হোরায়রা রা. বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার মক্কার হামাদান পাহাড়ের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। চলতে চলতে বললেন, তোমরা আরও অগ্রসর হও। শোনো, এই পাহাড়ের নাম হামাদান। আর 'তাকরীদ' তো আগেই এপথ অতিক্রম করেছে। সহচরবৃন্দ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! 'তাকরীদ' কে? তিনি স. বললেন, অত্যধিক জিকিরকারী নারী-পুরুষ। মুসলিম।

হজরত আবু মুসা আশয়ারী রা. বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. বলেছেন, যারা জিকির করে এবং যারা জিকির করে না, তাদের দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃত। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা রা. বর্ণনা করেছেন, রসুলে আকরম স. বলেছেন, আল্লাহ্র এক দল ফেরেশতা আছে, যারা জিকিরকারীদের সমাবেশ সন্ধান করে ফেরে। কোথাও জিকিরের সমাবেশ দেখতে পেলে একজন আর একজনকে ডেকে বলে, এসো এসো এই যে এখানে। তখন সকলে সেখানে সমবেত হয়। ঘিরে ফেলে জিকিরের মজলিশ। একজনের উপরে একজন— এরকম করতে করতে ফেরেশতাবৃন্দ পৌঁছে যায় আকাশের কাছাকাছি। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করেন, আমার দাসেরা কী বলে? ফেরেশতারা জবাব দেয়, বর্ণনা করে তোমার পবিত্রতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমা। আল্লাহ্ বলেন, তারা কি আমাকে দেখেছে? ফেরেশতারা বলে, না। আল্লাহ্ বলেন, যদি দেখতো? ফেরেশতারা বলে, তবে তো তাদের জিকির ও ইবাদতে প্রকাশ পেতো আরো বেশী আবেগ, উদ্দীপনা ও উচ্ছ্বাস। তোমার পবিত্রতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমা প্রকাশ করতো আরো অধিক উৎসাহভরে। আল্লাহ্ প্রশ্ন করেন, তারা কী চায়? ফেরেশতারা বলে, জান্নাত। আল্লাহ্ বলেন, তারা কি জান্নাত দেখেছে? ফেরেশতারা জবাব দেয়, না। আল্লাহ্ বলেন, যদি দেখতো? ফেরেশতারা বলে, তাহলে তো তাদের জান্নাতলাভের

কামনা হতো আরো অধিক প্রবল। আল্লাহ্ পুনরায় প্রশ্ন করেন, তারা পরিত্রাণ চায় কোন্ বস্তু থেকে? ফেরেশতারা বলে, জাহান্নাম থেকে? আল্লাহ্ বলেন, তারা কি কখনো জাহান্নাম দেখেছে? ফেরেশতারা জবাব দেয়, না। আল্লাহ্ বলেন, যদি দেখতো? ফেরেশতারা বলে, তাহলে তো তারা হয়ে যেতো আরো বেশী ভীতসন্ত্রস্ত। আল্লাহ্ তখন বলেন, হে ফেরেশতামণ্ডলী! তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। জনৈক ফেরেশতা বলে, কিন্তু ওদের মধ্যে একজন তো ঘটনাক্রমে সেখানে উপস্থিত হয়েছে। জিকিরের উদ্দেশ্য তার ছিলোই না। আল্লাহ্পাক বলেন, আমার জিকিরকারী বান্দাগণের সঙ্গে যারা উপবেশন করে, তারা কখনো হতভাগ্য নয়। বোখারী। মুসলিমও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনার শেষাংশটি এরকম— জনৈক ফেরেশতা তখন বলে, হে আমাদের প্রভুপালনকর্তা! একজন পথিক ভুলক্রমে সেখানে বসে পড়েছে। আল্লাহ্ বলেন, আমি তাকেও মার্জনা করলাম। জিকিরকারীদের দলভুক্তরা সৌভাগ্যবঞ্চিত হয় না। হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. আজ্ঞা করেছেন, স্বর্গোদ্যানের পাশ দিয়ে গমন করার সুযোগ পেলে স্বর্গস্বাদ গ্রহণ না করে চলে যেয়ো না। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! স্বর্গোদ্যান আবার কী? তিনি স. বললেন, জিকিরের অধিবেশন।

হজরত মুয়াবিয়া রা. থেকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, একবার সাহাবীগণের এক সমাবেশ দেখে রসুলেপাক স. থামলেন। বললেন, তোমরা এখানে কেনো সমবেত হয়েছো? সাহাবীগণ জবাব দিলেন, আমাদেরকে প্রদত্ত অনুগ্রহরাজির স্মৃতিচারণার্থে। আমরা অনুগ্রহদাতার স্তব-স্তুতি বর্ণনা করছি। তিনি দয়া করে আমাদেরকে বানিয়েছেন মুসলমান। এ যে তাঁর সীমাহীন কৃপা। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্ তোমাদের মতো বান্দাকে নিয়ে গর্ব করেন।

ইমাম মালেক বলেছেন, আমার নিকটে এই তথ্যটি পৌঁছেছে যে, রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, জিকিরমগ্ন ও জিকিরবিচ্যুতদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে যথাক্রমে সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে অকুতোভয় যোদ্ধা এবং ধর্মযুদ্ধ থেকে পলাতক কাপুরুষ।

রাযীন বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্র স্মরণ থেকে উদাসীন ব্যক্তিদের মধ্যে জিকিরকারী যেনো বিরসবৃক্ষকাণ্ডে পল্লবিত শাখা। যেনো অন্ধকার গৃহমধ্যে প্রদীপের আলো। যারা অমনোযোগীদের মধ্যে আল্লাহ্র স্মরণে রত, মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহ্ দেখিয়ে দেন তাদেরকে তাদের জান্নাতের ঠিকানা। তাদের পাপ মানব-দানব-প্রাণী-পাখির সমতুল হলেও আল্লাহ্ তা মাফ করে দেন।

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবালের বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্র শাস্তি থেকে নিষ্কৃতিপ্রদায়ক একমাত্র আমল হচ্ছে জিকির। মালেক, তিরমিজি, ইবনে মাজা।

হজরত আবু সাঈদ খুদরীর বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, ফেরেশতারা জিকিরের মহফিলকে বৃত্তকারে ঘিরে রাখে। আল্লাহ্র করুণার বিরতিহীন বর্ষণ হয় ওই মহফিলের উপর। অবতীর্ণ হয় সাকিনা (আত্মিক প্রশান্তি)। আর আল্লাহ্ জিকিরকারীদের আলোচনা করেন তাঁর নৈকট্যভাজন ফেরেশতাদের সঙ্গে। মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে, তার কাছে আমি তেমনই। আর আমাকে যখন সে স্মরণ করে, তখন আমি হই তার অঙ্গ। যদি সে আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, তবে আমিও তাকে স্মরণ করি সঙ্গোপনে। আর যদি সে আমাকে স্মরণ করে বৃন্দবদ্ধ হয়ে, তখন আমিও তাকে স্মরণ করি ফেরেশতাদেরকে সঙ্গে নিয়ে। বোখারী, মুসলিম।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এখানকার 'আল্লাহ্র স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ' কথাটির মর্মার্থ হচ্ছে— তোমরা আমাকে স্মরণ করলে আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো। মানুষ মুখাপেক্ষী। তাই আল্লাহ্র জিকির তার কর্তব্য ও প্রয়োজন। কিন্তু আল্লাহ্ চির অমুখাপেক্ষী। সুতরাং অন্যের জিকির করা তাঁর কর্তব্য, প্রয়োজন কোনোটাই নয়। অথচ তিনি দয়া করে জিকিরকারীদের জিকির করেন। সুতরাং বুঝতে হবে আল্লাহ্র জিকির করার বিষয়টিই সর্বশ্রেষ্ঠ। এরকম তাফসীর বর্ণিত হয়েছে মুজাহিদ, ইকরামা এবং সাঈদ ইবনে যোবায়ের থেকে। আরেক বর্ণনা অনুসারে হজরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনাও এরকম।

বাগবী লিখেছেন, নাফেয়ের মধ্যস্থতায় মুসা ইবনে উকবার বিবরণে এসেছে, হজরত ওমরও সর্বোন্নত সূত্রে রসুলেপাক স. থেকে সরাসরি এরকম ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। এমতাবস্থায় আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াবে এরকম— তোমরা আল্লাহ্র জিকির করতে কার্পণ্য কোরো না। কারণ জিকিরকারী আল্লাহ্পাকের অতুলনীয় স্মরণভূত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে। মনে রেখো, তোমাদের স্মরণের তুলনায় আল্লাহ্র স্মরণ অনেক অনেক বেশী শ্রেষ্ঠ, মহিমান্বিত ও গৌরবের।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَ ذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا -

(তোমাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করে, তাহাদের জন্য রসূলুল্লাহ্র মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ)। সুরা আহযাব, আয়াত ২১।

ব্যাখ্যাঃ 'তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও আখেরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করে' অর্থ আল্লাহ্র নিকট থেকে যারা আকাঙ্খী হয় পুণ্যের, পুণ্যময় দীদারের, অর্থাৎ পারলৌকিক সফলতার। এরকম ব্যাখ্যা করেছেন হজরত ইবনে আব্বাস রা.। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এখানে আল্লাহ্কে ভয় করার অর্থ আল্লাহ্র অনুগ্রহের আশা করা ও শাস্তির ভয় করা। বিশেষ করে, আশা করা পরকালের পুরস্কারের এবং ভয় করা তিরস্কারের। যেমন আরববাসীগণ বলেন, 'আরজু যায়দান ও ফাদ্বলাহু' (আমি যায়েদের করুণাকামী)। মুকাতিল বলেছেন, এখানে কথাটির অর্থ যারা শংকিত থাকে মহাবিচারদিবসের ভয়ে। আর 'আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করে' অর্থ আল্লাহ্কে স্মরণ করে সুখে দুঃখে সব সময়। উল্লেখ্য, অধিক স্মরণই হয় অব্যাহত আনুগত্যের কারণ। সেজন্যই এখানে আল্লাহ্কে ভয় করার সঙ্গে সঙ্গে বলা হয়েছে তাঁকে অধিক স্মরণ করার কথা। অর্থাৎ যারা আল্লাহ্কে ভয় করে এবং তাঁকে অধিক স্মরণ করে, তাঁরাই হয় তাঁর রসুলের একান্ত অনুগামী।

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَ الذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ الذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا -

(অবশ্য আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সওম পালনকারী পুরুষ ও সওম পালনকারী নারী, যৌন অঙ্গ হিফাযতকারী পুরুষ এবং যৌন অঙ্গ হিফাযতকারী নারী, আল্লাহ্কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী— ইহাদের জন্য আল্লাহ্ রাখিয়াছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান)। সুরা আহযাব, আয়াত ৩৫।

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালা যাদেরকে তার ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন, এখানে তাঁদের কথা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। শেষে উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ্কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ এবং অধিক স্মরণকারী নারীদের কথা।

হজরত মুয়াজ রা. বর্ণনা করেছেন, একবার এক লোক রসুলে করীম স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, হে রসুলগণের মুকুটমণি! সর্বাধিক পুণ্যের অধিকারী কোন মুজাহিদ? তিনি স. বললেন, যে আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করে। লোকটি পুনরায় প্রশ্ন করলো, সর্বাধিক পুণ্যবান রোজাদার কে? তিনি স. বললেন, যে আল্লাহ্র সর্বাধিক জিকিরকারী। এভাবে সে একে একে প্রশ্ন করলো সর্বাধিক পুণ্যবান নামাজ, হজ্ব, জাকাত ও দান খয়রাতকারী সম্পর্কে। রসুল স. তার প্রতিটি প্রশ্নের জবাবে বললেন, যে আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করে। এরকম প্রশ্নোত্তর শুনে হজরত আবু বকর হজরত ওমরকে বললেন, সর্বাধিক জিকিরকারীরাই যে অধিকারী হলো সর্বাধিক পুণ্যের। রসুল স. বললেন, অবশ্যই।

বাগবী লিখেছেন, মুজাহিদ বলেছেন, যে ব্যক্তি মোটেও আল্লাহ্র স্মরণবিচ্যুত হয় না, বরং দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে— সর্বাবস্থায় আল্লাহ্কে স্মরণ করে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত জিকিরকারী। আমি বলি, কলবের ফানা না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত জিকিরকারী হওয়া যায় না। যখন কলব আল্লাহ্র জিকিরে পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হয়, তখনই কেবল হৃদয়ে জাগ্রত থাকে আল্লাহ্র সতত স্মরণ।

রসুল স. বলেছেন, ইফরাদকারীরাই অগ্রগামী। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র রসুল! ইফরাদকারী কারা? তিনি স. বললেন, আল্লাহ্কে অধিক স্মরণকারী নারী ও পুরুষ। তিনি স. আরো বললেন, আল্লাহ্র আযাব থেকে পরিত্রাণ দিতে পারে কেবল আল্লাহ্র জিকির। সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্র পথে জেহাদও কি আল্লাহ্র জিকিরের সমতুল্য নয়? তিনি স. বললেন, না। জেহাদও জিকিরের তুল্য নয়। তবে যুদ্ধ করতে করতে যদি কোনো মুজাহিদের তলোয়ার ভেঙে যায়, তবে তার মর্যাদা হবে অধিক। বায়হাকী তাঁর দাওয়াতুল কবীর গ্রন্থে হজরত ইবনে ওমর সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

হজরত আবু সাইদ খুদরী রা. বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. সকাশে নিবেদন করা হলো, হে আল্লাহ্র বার্তাবাহক! মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্ সকাশে কে হবে অন্যাপেক্ষা অধিক মর্যাদাবান? তিনি স. বললেন, অধিক জিকিরকারী রমণী ও পুরুষ। পুনঃ নিবেদন করা হলো, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! আল্লাহ্র পথে যারা যুদ্ধ করে, তাদের চেয়েও কি? তিনি স. বললেন, হ্যাঁ, যদিও সে যোদ্ধা আল্লাহ্র দুশমন নিধন করতে গিয়ে ভেঙে ফেলে তার তরবারী। আহ্মদ, তিরমিজি।

ইমাম মালেক বলেছেন, আমার নিকট পৌঁছেছে এই হাদিসটি— রসুল স. বলেছেন, আল্লাহ্‌র স্মরণবিচ্যুতদের মধ্যে জিকিরকারীর অবস্থান এরকম— যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে পলায়নপর যোদ্ধাদের মধ্যে স্বস্থানে অটল কোনো মুজাহিদ, যেনো বিশুষ্ক বৃক্ষের একটি সতেজ শাখা, যেনো অন্ধকার গৃহমধ্যে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ। জিকিরবিস্মৃতদের মধ্যে অবস্থানকারী জিকিরকারীকে দেখানো হয় তার জান্নাতের আবাস। আল্লাহ্ তাদেরকে মার্জনা করেন পৃথিবীর সবাক ও নির্বাক প্রাণীকুলের সমতুল পাপকর্ম করলেও। ইবনে রযীন।

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا - وَّ سَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا -

(হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করো, এবং সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো)। সুরা আহযাব, আয়াত ৪১, ৪২।

ব্যাখ্যাঃ এখানেও 'আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করো' অর্থ তোমরা প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত করো আল্লাহ্‌র জিকিরের সঙ্গে।

হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা প্রতিটি পুণ্যকর্মের সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু জিকিরের জন্য কোনো সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেননি। অক্ষমতার ক্ষেত্রে অবশ্য বিধানটি শিথিল হলেও হতে পারে। কিন্তু জিকিরের কোনো সীমানা আসলে নেই। নেই কোনো অজুহাতও। বিষয়টি শিথিল কেবল পাগলদের ক্ষেত্রে। অন্য সকলের ক্ষেত্রে বিধানটি অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ কোনো অবস্থাতেই জিকির পরিত্যাগ করা যাবে না। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে 'যারা জিকির করে দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে......'। এখানেও তেমনি বলা হয়েছে— তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করো অধিক পরিমাণে। অর্থাৎ জিকির করো নিশিথে-দিবসে-জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সুস্থ-অসুস্থ প্রকাশ্য-গোপন সকল অবস্থায়।

মুজাহিদ বলেছেন, অধিক পরিমাণে জিকির করার মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্‌র কথা কখনোই বিস্মৃত হওয়া যাবে না। আমি বলি, এরকম অবস্থা লাভ হতে পারবে কেবল তখন, যখন লাভ হবে ফানায়ে কলব। এমতাবস্থায় অন্তর্জগতে সতত জাগ্রত থাকে আল্লাহ্‌র জিকির।

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ فَوَيْلٌ لِّلْقٰسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ -

(আল্লাহ্ ইসলামের জন্য যাহার বক্ষ উন্মোচন করিয়া দিয়াছেন এবং যে তাহার প্রতিপালক প্রদত্ত আলোতে রহিয়াছে, সে কি তাহার সমান, যে এরূপ নহে?

দুর্ভোগ সেই কঠোর হৃদয় ব্যক্তিদের জন্য, যাহারা আল্লাহ্‌র স্মরণে পরাঙ্মুখ! উহারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে)। সুরা যুমার, আয়াত ২২।

ব্যাখ্যাঃ আয়াতখানির মর্মার্থ এরকম— আল্লাহ্ ইসলাম গ্রহণের জন্য যার বক্ষকে উন্মোচিত করে দিয়েছেন এবং ইসলাম গ্রহণ করার ফলে যে তার প্রভুপালক কর্তৃক প্রদত্ত জ্যোতি দ্বারা সমাবৃত রয়েছে, সে কি ওই লোকের সমতুল, যার বক্ষপ্রকোষ্ঠ রুদ্ধ? যার অন্তর আল্লাহ্‌র স্মরণমগ্ন নয়। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন দুর্ভোগ। সে স্পষ্টতই পথভ্রষ্ট।

'শারাহাল্লাহু সদরাহু' অর্থ আল্লাহ্ যার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। 'নূরিম্‌মির রব্বিহী' অর্থ প্রভুপালক প্রদত্ত নূর। জ্যোতি বা আলো। উল্লেখ্য, এই আলোই সত্য ও মিথ্যার স্বরূপ প্রদর্শক। এই আলো যে পায়, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি তার বিশ্বাস হয়ে যায় চিরঅক্ষয়। আর এতে করে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, ইমান বা বিশ্বাসকে ধারণ করে কলব বা অন্তর। মস্তিষ্ক বা অন্য কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইমানকে ধারণ করে না। আল্লাহ্ প্রদত্ত এই আলোর অধিকারীদেরকেই বলা যেতে পারে আলোকিত মানুষ। তাঁদেরই হৃদয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করে ইসলামের নির্দেশাবলী। হয়ে যায় অপরিমেয়রূপে প্রশস্ত, যেমন কোনো আধার তার আধেয়কে ধারণ করে প্রসারিত হয় প্রয়োজনানুসারে বিনা প্রয়াসে। আর এখানকার নূর শব্দটির প্রকৃত অর্থ দিব্যদৃষ্টি বা অন্তর্দৃষ্টি।

আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য উপস্থাপনা করা হয়েছে জিজ্ঞাসার আকারে। তাই প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে 'আফামান' এবং এর প্রবণতা রয়েছে 'ফা' সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর দিকে। এমতাবস্থায় বক্তব্যরূপটি হয়েছে এরকম— বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে যখন পার্থক্য প্রমাণিত হলো, তখন হে আমার নবী! তাদের অভ্যন্তরীণ বৈপরীত্যের বিষয়টিও শুনে রাখুন— প্রকৃত বিশ্বাসীদের অন্তরসমূহকে আল্লাহ্ ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রশস্ত করে দিয়েছেন। ফলে তারা বক্ষে ধারণ করে এক বিশেষ নূর, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি। হয়ে যায় প্রকৃত অর্থে মু'মিন ও সত্যাধিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ যাদের অবরুদ্ধ বক্ষকে উন্মুক্ত করেননি, তাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন চিরভ্রষ্টতার মোহর, সত্য প্রত্যাখ্যান তাদের জন্য স্বাভাবিক। তাদের ভ্রান্তি সুস্পষ্ট। এখন আপনিই বলুন, বিশ্বাসী ও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী কি তাহলে সমান?

হজরত ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেছেন, একবার রসুলেপাক স. এই আয়াত পাঠ করে শোনালেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র বাণীবাহক! বক্ষ উন্মুক্ত হয় কীভাবে? তিনি স. বললেন, অন্তরে প্রবেশ করে এক বিশেষ নূর, ফলে কলব হয়ে যায় সুউন্মুক্ত ও সুবিস্তৃত। আমরা বললাম, এর বাহ্যিক লক্ষণ কী? তিনি স. বললেন, পরকালের দিকে সর্বোতভাবে ঝুঁকে পড়া, প্রতারণা ও

অহমিকাপূর্ণ পৃথিবী থেকে দূরে অবস্থান করা, মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যুর জন্য যথাপ্রস্তুতি গ্রহণ করা। বাগবী, হাকেম, বায়হাকী।

'ফা ওয়াইলুল্ লিলক্বাসিয়াতি ক্বুলুবুহুম মিন জিকরিল্লাহ্' অর্থ দুর্ভোগ ওই কঠোরহৃদয় ব্যক্তিদের জন্য, যারা আল্লাহ্র স্মরণে পরাজ্মুখ। এখানে 'ফাওয়াইলুল্'এর 'ফা' কারণপ্রকাশক। আর 'মিন জিকরিল্লাহ্'র 'মিন' সময়নির্দেশক। অর্থাৎ যখন তাদের সম্মুখে আল্লাহ্কে স্মরণ করা হয়, অথবা পাঠ করা হয় আল্লাহ্র বাণী, তখন তাদের কলব হয়ে যায় আরো কঠোর। এভাবে দেখা যায় আল্লাহ্র জিকিরই তাদের কলব কঠোর, কঠোরতর হওয়ার কারণ।

আল্লাহ্র জিকির ইমানদার ও কাফেরের অন্তরে সৃষ্টি করে বিপরীত প্রতিক্রিয়া। আর এরকম হয় তাদের সম্প্রসারিত ও সংকুচিত বক্ষের কারণেই।

কোনো কোনো কোরআন ব্যাখ্যাতা বলেছেন— এখানে 'জিকরিল্লাহ্' কথাটির পূর্বে 'তারকা' (পরিত্যাগ) শব্দটি উহ্য রয়েছে। ওই উহ্যতাসহ বক্তব্যটি দাঁড়াবে— ওই সকল লোকের জন্য রয়েছে অতীব দুর্ভোগ, যাদের কলব আল্লাহ্র জিকির পরিত্যাগ করার কারণে কঠিন হয়ে গিয়েছে। মালেক ইবনে দীনার বলেছেন, হৃদয়ের কাঠিন্য অপেক্ষা অধিক কোনো শাস্তি বান্দার জন্য নির্ধারণ করা হয়নি। আর কোনো জাতির প্রতি তখনই আল্লাহ্র গজব পড়ে, যখন তাদের হৃদয় থেকে বের হয়ে যায় মমতা-কোমলতা।

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ - وَ اِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ -

(যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ্র স্মরণে বিমুখ হয় আমি তাহার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান, অতঃপর সেই হয় তার সহচর। শয়তানেরাই মানুষকে সৎপথ হইতে বিরত রাখে, অথচ মানুষ মনে করে তাহারা সৎপথে পরিচালিত হইতেছে)। সুরা যুখরুফ, আয়াত ৩৬, ৩৭।

ব্যাখ্যাঃ উদ্ধৃত আয়াতদ্বয়ের মর্মার্থ হচ্ছে— যে ব্যক্তি আল্লাহ্পাকের আকাশজ বাণীসম্ভার এই কোরআনের প্রতি বৈমুখ্য প্রদর্শন করে, মগ্ন থাকে ঘোর পার্থিবতায়, ফলে হয়ে পড়ে আল্লাহ্র স্মরণচ্যুত। আমি তার সহচররূপে নিযুক্ত করি এক শয়তান। ওই শয়তান তখন তাকে শুভপথানুসারী হতে দেয়ই না। ভ্রষ্টতাকে তার দৃষ্টিতে করে তোলে শোভন। সেকারণেই ভ্রষ্ট পথে পরিচালিত হওয়া সত্ত্বেও সে তখন মনে করে, তার পথই সঠিক পথ।

এখানে ‘নুক্বাইয়্যিদ লাহু শাইত্বানা’ অর্থ নিয়োজিত করি শয়তান। ‘ফাহুয়া লাহু ক্বরীন’ অর্থ সেই হয় তার সহচর। উল্লেখ্য, তার ওই শয়তান সহচরটিই তখন আল্লাহ্‌বিমুখ ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। আর অপবিশ্বাস ও পাপকে তার চোখে প্রতিভাত করায় সুন্দররূপে। আর সে-ও তখন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, তার আচরিত মতাদর্শই সৎমতাদর্শ।

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا -

(সুতরাং তুমি তোমার প্রভুপালকের নাম স্মরণ করো এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁহাতে মগ্ন হও)। সুরা মুয্‌যাম্মিল, আয়াত ৮।

ব্যাখ্যাঃ ‘ওয়াজ্‌কুরিসমা রব্বিকা ওয়া তাবাত্‌তাল ইলাইহি তাবতিলা’ অর্থ সুতরাং তুমি তোমার প্রভুপালনকর্তার নাম স্মরণ করো এবং কেবল তাঁতেই মগ্ন হও।

এখানে ‘প্রভুপালকের নাম স্মরণ করো’ অর্থ সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র জিকির করো। কোনো মুহূর্তের জন্য আল্লাহ্‌র জিকির থেকে অমনোযোগী থেকো না। বাক্যটির বক্তব্যগত যোগ রয়েছে ২ সংখ্যক আয়াতের ‘রাত্রি জাগরণ করো’ কথাটির সঙ্গে। উল্লেখ্য, সার্বক্ষণিক জিকির মুখের দ্বারা সম্ভব নয়। মুখ ও বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সম্পাদন করা যেতে পারে কেবল আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা, কোরআন পাঠ, নামাজ ইত্যাদি। সুতরাং বুঝতে হবে, এখানে কলব দ্বারা মনে মনে জিকির করার কথাই বলা হয়েছে। আর মনের জিকিরই প্রকৃত জিকির। মনই স্মরণের স্থান। যেমন এক হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, অমনোযোগীদের মধ্যে বসবাসকারী একজন জিকিরকারী বিত্তশালীদের মধ্যে ধৈর্যশীলদের মতো। এই হাদিস দৃষ্টে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, জিকির দ্বারা অমনোযোগিতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে এরই নাম জিকির বা আল্লাহ্‌র স্মরণ।

অমনোযোগিতাদুষ্ট নামাজ মূল্যহীন। আল্লাহ্‌র স্মরণবিহীন তসবীহ্‌, ক্বেরাত ধর্তব্যের বাইরে। অন্যমনস্ক হয়ে যে নামাজ আদায় করে তার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অনিবার্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এতোক্ষণ ধরে আমরা কোরআন মজীদে উল্লেখিত জিকির সম্পর্কিত আয়াতসমূহের বিবরণ পাঠ করলাম। আর আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা ব্যাপদেশে অনেক হাদিসও জেনে নিতে পারলাম। উল্লেখ্য, জিকির সম্পর্কে আরো অনেক আয়াত যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে বহুসংখ্যক হাদিসও। হাদিসের সেই বিশাল ভাণ্ডার থেকে আমরা এখানে এখন কিছুসংখ্যক হাদিস উল্লেখ করতে চাই। উল্লেখ থাকে যে, হাদিসসমূহ ব্যাখ্যাসহ উপস্থাপন করা হলো 'ফাযায়েলে জিকির' নামক গ্রন্থ থেকে।

১. রসুলুল্লাহ্ স. এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জিকির করে এবং যে ব্যক্তি করে না— এই দুইজনের উদাহরণ— জীবিত ও মৃত। যে জিকির করে সে জীবিত এবং যে জিকির করে না সে মৃত। বোখারী, মুসলিম, মেশকাত, দুররে মানসুর।

ব্যাখ্যাঃ জীবন সকলের নিকট প্রিয় এবং মৃত্যুকে সকলেই ভয় পায়। রসুলেপাক স. এর বাণীতে বলা হলো জিকির যারা করে না, তারা দৃশ্যত জীবিত হলেও প্রকৃত অর্থে মৃত। তার জীবন বিফল, অর্থহীন। যেমন এক কবি বলেন— আমার হায়াতকে জীবন বলা যায় না। প্রকৃত জীবন তো তার, বন্ধুর সঙ্গে যার মিলন হয়েছে।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, এই হাদিসে কলবের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জিকির করে, তার দিল জিন্দা থাকে, আর যে জিকির করে না, তার দিল মরে যায়।

সুফীগণ বা কামেল পীরগণ বলেন, এখানে জীবিত বলে চিরস্থায়ী জীবনের কথা বলা হয়েছে। কেননা যারা ইখলাসের সাথে অত্যধিক পরিমাণে আল্লাহ্র জিকির করে তারা কখনো মরে না, বরং পৃথিবী পরিত্যাগের পরও তারা জীবিতই থাকে। যেমন শহীদগণ সম্পর্কে কোরআন পাকে সুরা বাকারায় বলা হয়েছে—

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ

وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ -

'আল্লাহ্‌র পথে যাহারা নিহত হয় তাহাদিগকে মৃত বলিও না, বরং তাহারা জীবিত; কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করিতে পার না'। আয়াত ১৫৪। অনুরূপ জিকিরকারীদের জন্যও মৃত্যুর পর এক প্রকার বিশেষ জীবন আছে। সুরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে—

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ۭ بَلْ اَحْيَاۗءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ -

(যাহারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হইয়াছে, তাহাদিগকে কখনই মৃত মনে করিও না। বরং তাহারা জীবিত এবং তাহাদের প্রভুপালকের নিকট হইতে তাহারা জীবিকাপ্রাপ্ত)। আলে ইমরান, আয়াত ১৬৯।

ইমাম তিরমিজি বলেন, আল্লাহ্‌র জিকির শুষ্ক হৃদয়কে সিক্ত করে। হৃদয়ে আনে নম্রতা। আর যখন কলবে আল্লাহ্‌র জিকির থাকে না, তখন নফসের তপ্ততা ও কামনার আগুনে কলব এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শুষ্ক (মৃতপ্রায়) হয়ে যায়— ইবাদত-বন্দেগী করতে চায় না। যেমন শুকনো কাঠকে বাঁকা করা যায় না। কেবল যায় জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেওয়া।

২. রসুলুল্লাহ স. এরশাদ করেছেন, যদি কোনো লোকের অনেক টাকা পয়সা থাকে এবং সে অনেক দান খয়রাতও করতে থাকে এবং আর এক লোক যদি আল্লাহ্‌র জিকিরে মগ্ন থাকে, তবে জিকিরকারী ব্যক্তিই হবে উত্তম। দুররে মানসুর, তিবরানী।

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় নিঃসন্দেহে উত্তম। কিন্তু আল্লাহ্‌র জিকির অত্যুত্তম। সুতরাং ওই সকল বিত্তশালীরা কতোই না সৌভাগ্যবান, যারা আল্লাহ্‌র পথে অর্থ সম্পদ ব্যয় করার সঙ্গে আল্লাহ্‌র জিকিরও করে। এক হাদিসে আছে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেও বান্দার উপর প্রতিদিন সদকা খয়রাত করা হয়। প্রত্যেককেই তাদের যোগ্যতা অনুসারে কিছু না কিছু দেওয়া হয়। আর সবচেয়ে বড় নেয়ামত হচ্ছে আল্লাহ্‌র জিকির করার তওফিক (সামর্থ্য) লাভ। আর এক হাদিসে এসেছে, যে মৃত্তিকাখণ্ডের উপরে আল্লাহ্‌র জিকির করা হয়, সেই মৃত্তিকা তার সপ্তস্তরসহ অন্যান্য মৃত্তিকার কাছে গর্ব করে।

৩. নবীয়ে আখেরুজ্জামান স. এরশাদ করেছেন, জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশের পর পৃথিবীর কোনোকিছুর জন্য আক্ষেপ করবে না। আক্ষেপ করবে কেবল ওই সময়টুকুর জন্য, যে সময় অতিবাহিত হয়েছিলো আল্লাহ্‌র জিকির ব্যতিরেকে। তিবরানী, বায়হাকী, দুররে মানসুর।

ব্যাখ্যাঃ জান্নাতবাসীগণ যখন জিকিরের বিশাল বিনিময় স্বচক্ষে দেখবে, তখন সঙ্গত কারণেই জিকিরবিবর্জিত সময়ের জন্য আক্ষেপ করতে থাকবে। উল্লেখ্য, আল্লাহ্‌পাকের এমন বান্দাও আছেন, যাঁরা আল্লাহ্‌র জিকির ছাড়া পৃথিবীবাসের কোনো অর্থই খুঁজে পান না। হাফেজ ইবনে হাজার আস্‌কালানী র. তাঁর 'মোনাব্বেহাত' নামক পুস্তকে লিখেছেন, ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে মুয়াজ র. তাঁর প্রার্থনায় বলতেন, হে আমার আল্লাহ্! তোমার কাছে প্রার্থনা করা ছাড়া রাত ভালো লাগে না, তোমার ইবাদত ছাড়া দিন ভালো লাগে না, তোমার জিকির ছাড়া ভালো লাগে না পৃথিবী। তেমনি তোমার ক্ষমা ছাড়া আখেরাত ভালো লাগবে না। আর দীদার ছাড়াও ভালো লাগবে না জান্নাত।

৪. হজরত আবু হোরায়রা রা. এবং হজরত আবু সাঈদ রা. সাক্ষ্য দিচ্ছেন, আমরা রসুলুল্লাহ্ স. কে বলতে শুনেছি, তিনি স. এরশাদ করেছেন, যে জামাত আল্লাহ্‌র জিকিরে মগ্ন থাকে, ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে ফেলে। আল্লাহ্‌র রহমত তাদেরকে আবৃত করে নেয়। তাদের উপর অবতীর্ণ হতে থাকে সাকিনা। আর আল্লাহ্‌তায়ালা (তাঁর নিজস্ব মজলিশে গর্ব প্রকাশ ক'রে) তাদের সম্পর্কে আলোচনা করেন। দুররে মানসুর, হিসনে হাসিন, মেশকাত, তিরমিজি, ইবনে মাজা, মুসলিম।

ব্যাখ্যাঃ হজরত আবু যর রা. বলেন, রসুলুল্লাহ্ স. একবার বললেন, হে আবু যর! আমি তোমাকে আল্লাহ্‌কে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি। এটাই সকল শুভপরামর্শের মূল। কোরআন পাঠ ও আল্লাহ্‌র জিকিরের মহিমা অনুধাবন করতে সচেষ্ট হও। এর দ্বারা আসমানে তোমার আলোচনা হবে। আর এটা পৃথিবীতে হবে তোমার জন্য নূর। অধিকাংশ সময় নীরব থেকো। উত্তম উক্তি ব্যতীত বাক্য ব্যয় কোরো না। এতে করে শয়তান কাছে আসতে পারে না এবং পাওয়া যায় ধর্ম বিষয়ের সাহায্য। বেশী হাসাহাসি কোরো না। এতে হৃদয় হয়ে যায় মৃতবৎ। আর চেহারা থেকে চলে যায় নূর। জেহাদ করতে থাকো। কেননা এটাই আমার উম্মতের বৈরাগ্য। সহায়-সম্বলহীনদেরকে ভালোবাসো। তাদের সঙ্গেই অধিক সময় অতিবাহিত করো। তোমার চেয়ে নিম্নস্তরের যারা, তাদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখো। তোমার উপরের স্তরের যারা, তাদের প্রতি দৃষ্টি দিয়ো না। এরকম করলে আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে আর সমীহ করতে পারবে না। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা কোরো, যদিও তারা তোমার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছিন্ন করতে চায়। হক কথা বলতে সংকোচ কোরো না, কারো কাছে তা তিক্তবোধ হলেও। আল্লাহ্‌র ব্যাপারে কারো তিরস্কারের ভয় কোরো না। নিজের দোষ দেখার ব্যাপারে এমনভাবে মশগুল থাকো, যেনো অন্যের দোষ দর্শনের ফুসরত না পাও। যে দোষ তোমার মধ্যে

আছে, সে দোষে অন্যকে অভিযুক্ত কোরো না। হে আবু যর! শুভব্যবস্থা গ্রহণের চেয়ে উত্তম কোনো বুদ্ধিমত্তা নেই। অশুভ কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা সর্বোত্তম পরহেজগারী। আর সদ্ব্যবহার তুল্য কোনো ভদ্রতা নেই। জামে সগীর, তিবরানী।

'সাকিনা' অর্থ শান্তি, গভীর প্রশান্তি, অথবা বিশেষ রহমত। ইমাম নববী বলেন, 'সাকিনা' এমন যার মধ্যে শান্তি, রহমত সব কিছু আছে এবং তা অবতীর্ণ করা হয় ফেরেশতাদের সঙ্গে।

এই হাদিসে যে সকল ফেরেশতার কথা বলা হয়েছে, তারা এই বিশেষ কাজের জন্যই নিয়োজিত। অর্থাৎ যেখানে আল্লাহ্‌র জিকির হয়, সেখানে তারা সমবেত হয় এবং জিকির শুনতে থাকে। যেমন এক হাদিসে বলা হয়েছে, ফেরেশতাদের একটি দল বিক্ষিপ্তভাবে ঘোরাফেরা করতে থাকে। জিকিরের মহফিল দেখতে পেলে সঙ্গীদেরকে ডেকে বলে, এই যে, এদিকে এসো। তোমরা যা খুঁজছো, তা এখানে আছে। তারা ডাকে সাড়া দেয়। মহফিলকে ঘিরে ফেলে। উঠে পড়তে থাকে একজন আর একজনের পিঠে— এভাবে উঠে যায় আসমান পর্যন্ত।

৫. রসুলেপাক স. একবার সাহাবীগণের এক সমাবেশে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী কারণে তোমরা এখানে সমবেত হয়েছো? তাঁরা নিবেদন করলেন, আমরা আল্লাহ্‌র জিকির করছি। আর প্রকাশ করছি তাঁর প্রশংসা-প্রশস্তি-স্তব-স্তুতি এবং পবিত্রতা ও মহিমা-মাহাত্ম্য। তিনি দয়া করে আমাদেরকে ইসলাম দান করেছেন। এটা আমাদের প্রতি তাঁর সুবিশাল অনুগ্রহ। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ করে বলো, তোমরা কি শুধু এজন্যই এখানে বসে আছো? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। আমরা আল্লাহ্‌র শপথ করেই একথা বলছি। তিনি স. বললেন, তোমাদের প্রতি কোনো মন্দ ধারণার কারণে আমি তোমাদেরকে শপথ করতে বলিনি। শুভসংবাদ শোনো.... এই মাত্র ভ্রাতা জিব্‌রাইল আমাকে বলে গেলেন, আল্লাহ্‌পাক ফেরেশতাদের সামনে তোমাদের বিষয়ে গর্ব প্রকাশ করছেন। মুসলিম, তিরমিজি, নাসাঈ, মেশকাত, দুররে মানসুর।

ব্যাখ্যাঃ মোল্লা আলী ক্বারী বলেন, গর্ব করার অর্থ— আল্লাহ্‌তায়ালা ফেরেশতাদেরকে বলেন, দ্যাখো। এই লোকদেরকে দ্যাখো। তাদের সঙ্গে রয়েছে নফস ও কুপ্রবৃত্তির তাড়না, শয়তানের শত্রুতা, কামনা বাসনা এবং বহুবিধ পার্থিব প্রয়োজন। এতদসত্ত্বেও তারা আমার জিকিরে মশগুল। শতপ্রতিকূলতা তাদেরকে আমার জিকির থেকে পশ্চাদপসরণ করাতে পারছে না। তোমরা তো প্রতিকূলতাবিবর্জিত সৃষ্টি। তোমাদের জিকির তাই তাদের মতো মূল্যবান নয়।

৬. আমাদের রসুল স. বলেছেন, সাত প্রকার মানুষকে আল্লাহ্তায়ালা আপন রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় দান করবেন ওই দিন, যে দিন তাঁর রহমতের ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না। এক. ন্যায়পরায়ণ সম্রাট। দুই. ওই যুবক, যে যৌবনে আল্লাহ্র ইবাদত করে। তিন. ওই ব্যক্তি, যার হৃদয় মসজিদলগ্ন। চার. ওই ব্যক্তিবর্গ, যারা পরস্পরকে কেবল আল্লাহ্র জন্যই ভালোবাসে, যারা আল্লাহ্র জন্যই মিলিত ও পৃথক হয়। পাঁচ. ওই ব্যক্তি, যাকে সুন্দরী কোনো নারী আহবান করে, অথচ সে বলে আমি আল্লাহ্কে ভয় করি। ছয়. ওই ব্যক্তি যে এক হাতে সঙ্গোপনে দান করে এমনভাবে, তার অন্য হাত তা জানে না। সাত. ওই ব্যক্তি, যে নির্জনে আল্লাহ্র জিকির করে এবং তার দুই চোখ থেকে অশ্রু ঝ'রে পড়ে। বোখারী, মুসলিম, মেশকাত, তারগীব।

ব্যাখ্যাঃ 'অশ্রু ঝ'রে পড়ে' অর্থ বিগত জীবনে কৃত গোনাহ্সমূহের কথা মনে হয়— সে কারণে ঝ'রে পড়ে অনুতাপের অশ্রু। আবার আবেগ-অনুরাগের আতিশয্যেও ঝ'রে পড়তে পারে চোখের পানি। অর্থাৎ ওই জিকিরকারীর চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে আল্লাহ্র ভয়ে ও ভালোবাসায়। অর্জিত হয় ইখলাস (বিশুদ্ধতা)।

সুফিয়ায়ে কেরাম হাদিসে বর্ণিত 'খালিয়ান' (নির্জনতা) শব্দটির অর্থ করেছেন দু'রকম— ১. নির্জনে জিকির ২. গাইরুল্লাহ্র চিন্তা থেকে মুক্ত কলবী জিকির। এটাই আসল নির্জনতা। বাইরের শত কোলাহলও এমতাবস্থায় কলবে প্রবেশ করে না (এটা নকশবন্দিয়া তরিকার একটি বৈশিষ্ট্য)। এই তরিকার শায়েখগণ এর নাম দিয়েছেন 'খেলাওয়াত দর আনজুমান', অর্থঃ জনতার মধ্যে নির্জনতা।

এক হাদিসে বলা হয়েছে, আল্লাহ্র ভয়ে রোদনকারী স্তন থেকে বের হয়ে যাওয়া দুধ পুনরায় স্তনে প্রবেশ না করা পর্যন্ত জাহান্নামে যাবে না। আর এক হাদিসে এসেছে, আল্লাহ্র ভয়ে যে ব্যক্তির চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়, কিয়ামতের দিন তার আযাব হবে না। অন্য এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, দুই প্রকার চোখের জন্য জাহান্নাম হারাম। এক প্রকার— আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দনকারী চোখ। অন্য প্রকার— কাফেরদের অনিষ্ট থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের হেফাজতের জন্য জাগ্রত চোখ।

এক কবিতায় আছে—

'প্রিয়তমের স্মরণে সারারাত কেঁদে কাটানোই আমার কাজ। আর তাঁর ধ্যানে বিভোর হয়ে যাওয়াই আমার নিদ্রা'।

এক হাদিসে এসেছে, আল্লাহ্‌র ভয়ে রোদনকারী, আল্লাহ্‌র পথে জাগরণকারী এবং অবৈধ বস্তুর প্রতি (যেমন বেগানা রমণী) দৃষ্টি দান থেকে বিরত চোখের জন্য দোজখের আগুন নিষিদ্ধ। দোজখের আগুন নিষিদ্ধ ওই চোখের জন্যও, যে চোখ নষ্ট হয়েছে আল্লাহ্‌র পথে। আর এক হাদিসে এসেছে, নির্জনে আল্লাহ্‌র জিকিরকারী যেনো কাফেরদের বিরুদ্ধে একাই রুখে দাঁড়িয়েছে।

৭. রসুলে আকরম স. এরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, বুদ্ধিমান লোকেরা কোথায়? মানুষেরা জিজ্ঞেস করবে, বুদ্ধিমান কারা? উত্তরে বলা হবে, যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে (সর্বাবস্থায়) আল্লাহ্‌র জিকির করতো। আর আকাশ-পৃথিবীর সৃষ্টিনৈপুণ্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতো। আর বলতো, হে আল্লাহ্! তুমি তো এসকল কিছুকে অনর্থক সৃষ্টি করোনি। আমরা তোমার তসবীহ্ পাঠ করি। তুমি জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদেরকে রক্ষা করো। অতঃপর তাদের জন্য একটি পতাকা প্রস্তুত করা হবে। তারা ওই পতাকার পশ্চাতে চলতে থাকবে। আল্লাহ্ বলবেন, যাও। চিরদিনের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করো। দুররে মানসুর।

ব্যাখ্যাঃ ইবনে আবিদ্ দুনিয়ার এক বর্ণনায় এসেছে, একবার রসুলে করীম স. সাহাবীগণের এক সমাবেশস্থলে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, সবাই চুপচাপ বসে আছে। তিনি স. জিজ্ঞেস করলেন, কী ভাবছো? তাঁরা বললেন, আল্লাহ্‌র মহাসৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করছি। তিনি স. বললেন, হ্যাঁ। আল্লাহ্‌র সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করো। তাঁর সত্তাকে চিন্তায়ত্ত করতে চেয়ো না। তিনি তো চিন্তা-ধারণার অতীত।

এক লোক একবার উম্মতজননী হজরত আয়েশা সিদ্দিকার কাছে উপস্থিত হয়ে বললো, হে উম্মতজননী! রসুলুল্লাহ্ স. এর জীবনের কোনো একটি বিস্ময়কর কথা আমাকে শোনান। তিনি স. বললেন, তাঁর কোন কথাটি বিস্ময়কর নয়। শোনো- একবার রাতে তিনি আমার ঘরে এলেন। আমার কম্বলের নিচে শুয়ে পড়লেন। একটু পরেই বললেন, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি আমার প্রভুপালকের ইবাদত করবো। একথা বলেই তিনি উঠে পড়লেন। অজু করলেন। নামাজে দাঁড়ালেন। এতো কাঁদলেন যে, চোখের পানিতে তাঁর পবিত্র বক্ষদেশ ভিজে গেলো। রুকু ও সেজদার সময়ও তিনি অনেক কাঁদলেন। সারারাত কেঁদেই কাটালেন। রাত শেষ হলো। বেলাল এসে ডাকলো। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক! আল্লাহ্‌তো আপনাকে মাফ করে দিয়েছেন (আপনি তো নিষ্পাপ) তবু আপনি এতো কাঁদেন কী কারণে? তিনি বললেন, আমি কি আল্লাহ্‌র

কৃতজ্ঞচিত্ত বান্দা হবো না। কেনো কাঁদবো না— আজই তো আমার উপরে অবতীর্ণ হয়েছে ইন্না ফী খলক্বিস সামা ওয়াতি ওয়াল আরদ্ব...... ফাক্বিনা আযাবান্নার পর্যন্ত। নতুন অবতীর্ণ এই আয়াত আবৃত্তি শেষ করে তিনি বললেন, ওই ব্যক্তির ধ্বংস নিশ্চিত, যে এই আয়াতগুলো পাঠ করে, অথচ এ নিয়ে ভাবে না।

আবদে কায়েস বলেন, আমি বহুসংখ্যক সাহাবীকে বলতে শুনেছি, তাঁরা বলেছেন, ইমানের নূর হলো চিন্তা-ফিকির। হজরত আবু হোরায়রা রা. রসুলেপাক স. সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এক লোক তার বাড়ির ছাদে শুয়ে আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলো। এক সময় বলে উঠলো, আল্লাহ্‌র শপথ! আমার হৃদয় সাক্ষ্য দিচ্ছে- এই বিশাল সৃষ্টির স্রষ্টা নিশ্চয়ই আছেন। হে আমার আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ্ তার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকালেন। সে পেলো মহান মার্জনা।

হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, এক মুহূর্ত চিন্তা-ফিকির করা সারা রাতের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম। হজরত আবু দারদা এবং হজরত আনাস থেকেও এরকম বর্ণনা এসেছে। হজরত আনাস বলেছেন, আল্লাহ্‌র সৃষ্টিনৈপুণ্যবিষয়ক এক মুহূর্তের চিন্তা-ফিকির আশি বছরের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম। সাহাবী হজরত আবু দারদার মাকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার ছেলের শ্রেষ্ঠ ইবাদত কী? তিনি বললেন, চিন্তা-ফিকির। হজরত আবু হোরায়রা রসুলেপাক স. সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কিছুক্ষণের চিন্তা-ফিকির ষাট বছরের ইবাদতের চেয়ে উত্তম।

ইমাম গায্যালী লিখেছেন, চিন্তা-ফিকিরকে উত্তম ইবাদত বলা হয়েছে এ কারণে যে— চিন্তা-ফিকিরের মধ্যে জিকিরের দিকটা তো আছেই, তদুপরি আছে আরো দুটি বিষয়— একটি আল্লাহ্‌র মারেফাত। চিন্তা-ফিকির হচ্ছে মারেফাতের চাবিকাঠি। দ্বিতীয়টি হলো— আল্লাহ্‌র মহব্বত— যা ফিকিরের দ্বারাই লাভ হয়। এই চিন্তা-ফিকিরকেই সুফীগণ মোরাক্বাবা বলেন।

হজরত জুনায়েদ বাগদাদী র. বলেছেন, একবার আমি শয়তানকে বস্ত্রবিবর্জিত অবস্থায় দেখলাম। বললাম, মানুষের মধ্যে উলঙ্গ হয়ে চলাফেরা করো— তোমার লজ্জা নেই? শয়তান বললো, এরা কি মানুষ? মানুষ তো শোনিজিয়ার মসজিদে উপবিষ্ট ওই কয়জন। ওরা আমার শরীরকে নিস্তেজ করে দিয়েছে। কলিজাকে করে দিয়েছে কাবাব। হজরত জুনায়েদ বলেন, আমি কৌতূহলবশতঃ শোনিজিয়ার মসজিদে গেলাম। দেখলাম সেখানে কয়েকজন বুজুর্গ হাঁটুর উপরে মাথা রেখে মোরাক্বাবায় মগ্ন। তাঁরা আমাকে দেখে বললেন, খবিস শয়তানের কথায় প্রতারিত হয়ো না।

এরকম ঘটনা বর্ণিত হয়েছে মাসুহী র. থেকেও। তিনিও একবার শয়তানকে বস্ত্রহীন অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করলেন, মানুষের সমাজে এভাবে উলঙ্গ হয়ে চলাচল করতে তোর শরম করে না? সে বললো, আল্লাহ্র শপথ! এরা তো মানুষ নয়। যদি সেরকম হতো, তবে আমি তাদেরকে নিয়ে এভাবে খেলা করতে পারতাম না, যেভাবে শিশুরা খেলা করে ফুটবল নিয়ে। মানুষ তো ওই সকল লোক। ওরা আমাকে অসুস্থ করে দিয়েছে। এই কথা বলে সে সুফিয়ায়ে কেরামের জামাতের দিকে ইশারা করলো।

হজরত আবু সাঈদ খাযরায বলেন, একবার আমি স্বপ্নে দেখলাম, শয়তান আমাকে আক্রমণ করতে আসছে। আমি তাকে লাঠি দিয়ে মারতে শুরু করলাম। সে কাবু হলো না। এমন সময় অদৃশ্য স্থান থেকে কে যেনো বললো, শয়তান লাঠিকে ভয় পায় না। ভয় পায় কলবের নূরকে।

এক হাদিসে এসেছে, রসুলেপাক স. এরশাদ করলেন, তোমরা আল্লাহ্কে 'জিক্রে খামেল' দ্বারা স্মরণ করো। জিজ্ঞেস করা হলো, জিক্রে খামেল কী? তিনি স. বললেন, গোপন জিকির।

৮. রসুলে আকরম স. এরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্তায়ালা এমন কিছুসংখ্যক লোককে একত্র করাবেন, যাদের চেহারায় নূর চমকাতে থাকবে। তারা মোতির মিম্বরে উপবিষ্ট থাকবে। তারা হবে অন্য অনেকের হিংসার কারণ। তারা নবীও হবে না, হবে না শহীদও। উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! তাদেরকে চেনা যাবে কীভাবে? তিনি স. বললেন, যারা বিভিন্ন এলাকা থেকে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে এসে সমবেত হয় এবং আল্লাহ্র জিকিরে মগ্ন হয়। তিবরানী, তারগীব, দুররে মানসুর।

ব্যাখ্যাঃ এক হাদিসে এসেছে, জান্নাতে ইয়াকুত পাথরের খুঁটির উপরে যাবারজাদ পাথরের বালাখানা থাকবে। ওই বালাখানার চতুর্দিকের দরজাসমূহ থাকবে উন্মুক্ত এবং উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো সমুজ্জ্বল। ওই সকল বালাখানায় থাকবে তারা, যারা পৃথিবীতে পরস্পরের মধ্যে আল্লাহ্র ওয়াস্তে মহব্বত রাখে, সমবেত হয় এবং পরস্পরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত করে (বলা বাহুল্য, এ সকল আমল হয় কেবল পীর মোর্শেদগণের খানকায়)।

এক হাদিসে এসেছে, যে গৃহে জিকির করা হয়, সেই গৃহ আসমানবাসীদের কাছে এমন আলোকোজ্জ্বল দৃষ্টিগোচর হয়, যেমন পৃথিবীবাসীদের কাছে আলোকোজ্জ্বল দৃষ্টিগোচর হয় আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জকে।

সাহাবী হজরত আবু রযীন রা. বলেন, রসুলেপাক স. একবার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার দ্বীন ধর্মকে তুমি অধিকতর শক্তিশালী করবে কীভাবে,

তা কি তোমাকে বলবো? জিকিরকারীদের মজলিশ। ওই মজলিশের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক বজায় রেখো। তাহলেই লাভ করবে উভয় জগতের কল্যাণ। আর যখন তুমি একাকী হও, তখন যত বেশী পারো, আল্লাহ্‌র জিকির করতে থাকো।

এক হাদিসে এসেছে, সর্বোত্তম রিবাত হচ্ছে নামাজ ও জিকিরের মহফিল। উল্লেখ্য, কাফেরদের আক্রমণ প্রতিহত করবার উদ্দেশ্যে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা পাহারা দেওয়াকে বলে রিবাত।

৯. রসুলেপাক স. স্বগৃহে অবস্থান করছেন। এমন সময় 'ওয়াসবির নাফসাকা....' এই আয়াত অবতীর্ণ হলো। আয়াতে বলা হলো, হে আমার নবী! আপনি ওই সকল লোকের সঙ্গে উপবেশন করুন, যারা সকাল-সন্ধ্যায় আপনার প্রভুপালককে ডাকে'। আয়াতের নির্দেশ পালনার্থে তিনি স. ওই সকল লোকের সন্ধানে ঘর থেকে বের হলেন। এক স্থানে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, কিছুসংখ্যক সাহাবী আল্লাহ্‌র জিকিরে মশগুল। তাঁদের কারো কারো মস্তকের কেশ বিক্ষিপ্ত, শরীরের ত্বক শুষ্ক, পরনে মাত্র এক প্রস্থ বস্ত্র। তিনি স. তাঁদের সঙ্গে বসে পড়লেন এবং বললেন, সকল প্রশংসা-প্রশস্তি-স্তব-স্তুতি আল্লাহ্‌র, যিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন মর্যাদবান মানুষ সৃষ্টি করেছেন, যাদের সঙ্গে বসতে আমাকেই নির্দেশ দান করেছেন। তিবরানী, দুররে মানসুর ।

ব্যাখ্যাঃ অন্য এক হাদিসে এসেছে, রসুলেপাক স. তাঁদেরকে খুঁজতে খুঁজতে মসজিদের শেষ প্রান্তে উপবিষ্ট অবস্থায় পেলেন। সেখানে বসে বললেন, ওই মহাপবিত্র সত্তার জন্যই সকল প্রশংসা, যিনি আমার এই পৃথিবীর জীবনেই এমন এক দল মানুষ সৃষ্টি করেছেন, যাদের সঙ্গে বসতে আবার আমাকেই হুকুম করেছেন। তারপর বললেন, তোমরাই আমার জীবন-মরণের সাথী।

এক হাদিসে এসেছে, হজরত সালমান ফারসী কিছুসংখ্যক সাহাবীর সঙ্গে আল্লাহ্‌র জিকিরে বিভোর ছিলেন। সহসা সেখানে উপস্থিত হলেন রসুলেপাক স.। বললেন, তোমরা কী করছিলে? তাঁরা বললেন, আল্লাহ্‌র জিকির। তিনি স. বললেন, দেখতে পেলাম, তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হচ্ছে। মন চাইলো তোমাদের সঙ্গে বসতে। আলহামদুলিল্লাহ্! আল্লাহ্‌তায়ালা আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক সৃষ্টি করেছেন, যাদের সঙ্গে বসতে আমাকেই হুকুম দিয়েছেন।

হজরত ইব্রাহিম নখয়ী র. বলেন, 'আল্লাহ্‌কে ডাকে' বলে কোরআন মজীদে যে দলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সে দল হচ্ছে জিকিরকারীদের দল।

১০. রসুলে আকরম স. এরশাদ করেছেন, তোমরা যখন জান্নাতের বাগানের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করো, তখন সেখানে অধিক বিচরণ কোরো।

একজন নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক! জান্নাতের বাগান কী? তিনি স. বললেন, জিকিরের সমাবেশ। আহ্‌মদ, তিরমিজি।

ব্যাখ্যাঃ এখানকার 'অধিক বিচরণ কোরো' কথাটির অর্থ এরকম— পশুকুল কোনো শস্যক্ষেতে বিচরণকালে তাদেরকে লাঠির আঘাতে ফেরাতে চাইলেও তারা ফেরে না। তেমনি জিকিরকারীও যেনো দুনিয়াদারীর লাঠির আঘাতে জিকিরের মহফিল থেকে সরে না আসে।

জিকিরের জলসাকে জান্নাতের বাগান বলা হয়েছে একারণে যে, জান্নাত যেমন বিপদাপদমুক্ত, তেমনি জিকিরের জলসাও বিপদাপদবিমুক্ত। এক হাদিসে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌র জিকির দিলের জন্য শেফা অর্থাৎ কলবে অহংকার, হিংসা, লোভ ইত্যাদি যে সব রোগ হয় জিকির সেগুলোকে নিরাময় করে। 'ফাওয়ায়েদ ফিস্ সালাত' রচয়িতা লিখেছেন, সব সময় জিকির করলে বিপদ মুসিবত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

সহীহ্ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. এরশাদ করেছেন, আমি তোমাদেরকে বেশী বেশী করে আল্লাহ্‌র জিকির করতে নির্দেশ দিচ্ছি। জিকিরকারী এরকম— যেমন কোনো শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত ব্যক্তি নিরাপদ দুর্গে আশ্রয় নেয়। জিকিরকারী আল্লাহর সঙ্গী। জিকির দ্বারা হৃদয় অর্গলমুক্ত হয়, জ্যোতির্ময় হয়। দূর হয় অন্তরের কঠোরতা। জিকিরের জাহেরী বাতেনী অনেক উপকার আছে। আলেমগণ একশত উপকারের কথা লিখেছেন।

একবার হজরত আবু উমামা সকাশে উপস্থিত হয়ে এক ব্যক্তি বললো, আমি স্বপ্নে দেখলাম, আপনি গৃহমধ্যে থাকেন, অথবা থাকেন গৃহের বাইরে— থাকেন দণ্ডায়মান অথবা উপবিষ্ট, ফেরেশতারা আপনার জন্য দোয়া করে। তিনি বললেন, তুমি চাইলে ফেরেশতারা তোমার জন্যও দোয়া করতে পারে। একথা বলেই তিনি পাঠ করলেন 'ইয়া আইয়্যুহাল্‌লাজীনা আমানুজ্ কুরুল্লাহা জিকরান কাছীরা (হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অত্যধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌র জিকির করো)। সুরা আহযাব, আয়াত ৪১।

১১. রসুলুল্লাহ্ স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্‌র জিকির এতো বেশী করতে থাকো, যেনো লোকেরা তোমাদেরকে পাগল বলে। আহ্‌মদ, হাকেম, ইবনে হাব্বান, তারগীব।

ব্যাখ্যাঃ আর এক হাদিসে আছে, এমনভাবে জিকির করতে থাকো, যেনো মুনাফিকেরা তোমাকে রিয়াকার বলে। তারগীব, তিবরানী। হজরত ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে কাসীর বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালা তাঁর বান্দাদের উপর যে সকল বিষয় ফরজ করেছেন, সেগুলোর প্রত্যেকটির একটি সীমারেখা

আছে। আছে ওজর আপত্তিও। কিন্তু জিকিরের জন্য কোনো সীমা নির্ধারণ করেননি। আবার জ্ঞান বুদ্ধি থাকা অবস্থায় এক্ষেত্রে কোনো ওজর আপত্তি উত্থাপনেরও কোনো সুযোগ রাখেননি। বরং নির্দেশ করেছেন 'জিকরান কাছীরা' (অত্যধিক পরিমাণে জিকির করো)।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী তাঁর 'মোনাব্বেহাত' পুস্তকে লিখেছেন, হজরত ওসমান রা. এর কাছে একটি সোনার পাত ছিলো। তাতে লেখা ছিলো সাতটি ছত্র—

১. আমি বিস্ময়বোধ করি ওই ব্যক্তির জন্য, যে মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও হাসে।

২. আমি আশ্চর্য হই ওই লোকের কথা ভেবে, যে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে জেনেও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

৩. আমি তার কথা ভাবি আর বিস্মিত হই, যে তকদীরে বিশ্বাস করে, অথচ তার কোনোকিছু হারিয়ে গেলে দুঃখিত হয়।

৪. আমি আশ্চর্যান্বিত হই তার জন্য, যে আখেরাতে হিসাব দিতে হবে জেনেও ধনসম্পদ জমা করে।

৫. আমার কাছে বিস্ময়কর তার বিষয়টিও, যে জাহান্নামের কথা জেনেও পাপকর্মে লিপ্ত হয়।

৬. আমি আশ্চার্যবোধ করি তার কথা ভেবে, যে আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে অথচ স্মরণ করে অন্যের।

৭. আমি বিস্মিত হই ওই লোকের কথা ভেবে, যে জান্নাত সম্পর্কে জানে, অথচ শান্তি খোঁজে পৃথিবীতে।

৮. আমি বিস্মিত হই তার জন্যও, যে শয়তানকে শত্রু বলে জানে, অথচ তার অনুগত হয়।

হাফেজ ইবনে হাজার আর একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন হজরত জায়েদ রা. থেকে, যেখানে বলা হয়েছে, রসুলেপাক স. বলেছেন, জিব্রাইল আমাকে জিকির সম্পর্কে এতো বেশী তাগিদ করেছেন যে, আমার মনে হয়েছে, জিকির ছাড়া কোনো কিছুতেই কোনো কাজ হবে না।

হজরত আবদুল্লাহ্ জুল ইয়াজদাইন রা. একজন সাহাবী ছিলেন। শৈশবেই হয়েছিলেন এতিম। তাঁর চাচা তাঁকে লালন-পালন করতেন। তিনি গোপনে মুসলমান হয়েছিলেন। তাঁর চাচা একথা জানতে পেরে তাঁকে বাড়ি থেকে উলঙ্গ করে বের করে দেন। তাঁর মাও ছিলেন তাঁর প্রতি অতুষ্ট। তবু মায়ের মন- তিনি তাঁকে একটি মোটা চাদর দেন। ওই চাদর পরে তিনি উপস্থিত হন মদীনা

মুনাওয়ারায়। তিনি রসুলেপাক স. এর বহির্বাটিতে পড়ে থাকতেন, আর উচ্চস্বরে জিকির করতেন। হজরত ওমর রা. একবার বললেন, লোকটা এতো জোরে জিকির করে কেনো? লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নয়তো? রসুলেপাক স. একথা শুনতে পেয়ে বললেন, না। সেতো কোমলপ্রাণ ব্যক্তিদের দলভূত। তিনি তবুক যুদ্ধের সময় ইন্তেকাল করেন। ওই সময় এক রাতে সাহাবীগণ দেখলেন, উন্মুক্ত প্রান্তরে আলো জ্বলছে। কাছে গিয়ে দেখলেন, রসুলেপাক স. স্বয়ং সদ্য খননকৃত এক কবরে নেমেছেন। তিনি স. হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমরকে বলছেন, দাও। তোমাদের ভাইকে আমার হাতে দাও। তাঁরা নির্দেশ পালন করলেন। দাফন শেষে রসুলেপাক স. বললেন, হে আমার আল্লাহ্! আমি এ লোকের উপর সন্তুষ্ট। তুমিও এর প্রতি সন্তুষ্ট হও। হজরত ইবনে মাসউদ বলেন, আমার তখন মনে হলো, হায়! এই লাশটি যদি আমার হতো।

বিখ্যাত বুজুর্গ ফুজায়েল ইবনে আয়ায র. বলেন, মানুষ দেখে ফেলবে এই আশংকায় কোনো নেক আমল থেকে বিরত হওয়াও রিয়া। আর মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে আমল করা শিরিকের অন্তর্ভুক্ত।

এক হাদিসে আছে, কোনো কোনো মানুষ জিকিরের চাবি। তাদেরকে দেখলে আল্লাহ্র কথা মনে হয়। আর এক হাদিসে আছে, ওই সকল লোক আল্লাহ্র ওলী, যাদেরকে দেখলে আল্লাহ্র কথা স্মরণ হয়। অন্য এক হাদিসে এসেছে, তোমাদের মধ্যে উত্তম তারা, যাদেরকে দেখলে আল্লাহ্র জিকির জাগ্রত হয়। আর এক হাদিসে বলা হয়েছে, তোমাদের মধ্যে উত্তম ওই ব্যক্তি, যাকে দেখলে আল্লাহ্ স্মরণে আসে, যার কথা শুনলে এলেম বেড়ে যায় এবং যার আমল দেখলে আখেরাতের প্রতি আগ্রহ বেড়ে যায়।

১২. রসুলে আকরম স. এরশাদ করেছেন, কোনো কোনো মানুষ নরম বিছানার উপরে বসে আল্লাহ্র জিকির করে। আল্লাহ্পাক তাদেরকে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। দুররে মানসুর, ইবনে হাব্বান।

ব্যাখ্যাঃ দুনিয়ার কষ্টভোগ ও দুঃখযাতনা আখেরাতের উচ্চ মর্যাদা লাভের কারণ হয়। কিন্তু আল্লাহ্পাকের মোবারক জিকিরের বরকত এই যে, আরামের সঙ্গে কোমল শয্যায় বসেও যদি কেউ আল্লাহ্র জিকির করে, তবু ওই জিকির আখেরাতে তার মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হবে। রসুলেপাক স. একথাও বলেছেন যে, যদি তোমরা সব সময় জিকিরমগ্ন থাকো, তবে ফেরেশতারা ঘরে ও বাইরে তোমাদের সঙ্গে করমর্দন করতে শুরু করবে।

হজরত আবু দারদা রা. বলতেন, যদি সুখের সময় আল্লাহ্র জিকির করো, তবে দুঃখের সময় তা কাজে আসবে। হজরত সালমান ফারসী রা. বলেন, যে

বান্দা সুখের সময় আল্লাহ্র জিকির করে, সে দুঃখ-কষ্টে পড়লে ফেরেশতারা বলে, শোনো! এটা নিশ্চয় কোনো বিপদকবলিত বান্দার পরিচিত আওয়াজ। একথা বলে তারা ওই বান্দার পক্ষে আল্লাহ্তায়ালার দরবারে সুপারিশ করে। আর যে সুখের সময় জিকির করে না, সে দুঃখ-কষ্টে পড়লে ফেরেশতারা বলে, এ আওয়াজ তো তেমন পরিচিত নয়।

হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, জান্নাতের আটটি দরজা আছে, তন্মধ্যে একটি দরজা রয়েছে কেবল জিকিরকারীদের জন্য। এক হাদিসে এসেছে, যে আল্লাহ্র জিকির বেশী ক'রে করে, সে মুনাফিকি থেকে মুক্ত। আর এক হাদিসে আছে, আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালা অধিক জিকিরকারীকে ভালোবাসেন।

১৩. রসুলুল্লাহ্ স. এরশাদ করেছেন, যারা জিকিরের সমাবেশে হাজির হয় কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে, আসমানের এক ফেরেশতা তাদেরকে লক্ষ্য করে ঘোষণা করে, তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। তোমাদের পাপসমূহকে পুণ্যে পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে। আহ্মদ, তিবরানী, দুররে মানসুর।

ব্যাখ্যাঃ এর বিপরীতে রয়েছে আর একটি হাদিস, যেখানে বলা হয়েছে, যে সভা-সমাবেশে আল্লাহ্র জিকির হয় না, সেই সভা কিয়ামতের দিবসে হবে আক্ষেপের কারণ। আর এক হাদিসে এসেছে, যে সভায় আল্লাহ্র জিকির হয় না এবং আল্লাহ্র রসুলের উপরে দরূদ পাঠ করা হয় না, সেই সভায় সমবেত লোকেরা এরকম— যেনো তারা মৃত গাধা ভক্ষণ করে উঠলো। আর এক হাদিসে আছে, এরকম সভা কিয়ামতের দিন অনুতাপের কারণ হবে। অতঃপর আল্লাহ্পাক হয়তো দয়া করে তাদেরকে মাফ করে দিবেন, অথবা শাস্তি প্রদান করবেন।

অন্য এক হাদিসে আছে, তোমরা মজলিশের হক আদায় করো। বেশী করে আল্লাহ্র জিকির করো। পথিককে পথ দেখিয়ে দাও। অবৈধ কিছু সামনে পড়লে দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও।

পাপকে পুণ্যে পরিণত করার বিষয়টি ইখলাসের (বিশুদ্ধতার) উপরে নির্ভরশীল। যার কলব শুদ্ধ, ইখলাস অর্জন করতে পারে কেবল সে-ই। আর জিকির ছাড়া কলব শুদ্ধ হয় না। ইখলাস বা বিশুদ্ধ নিয়ত (কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি সাধনের উদ্দেশ্যে নেক আমল করা) বিশুদ্ধ কলব থেকেই উৎসারিত হয়।

নিম্নে দু'টি ঘটনার বিবরণ দেওয়া হলো। ঘটনা দুটোর প্রতি ভালোভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে ইখলাস কী তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

প্রথম ঘটনাঃ 'বাহ্জাতুন নুফুস' নামক পুস্তকে আছে, এক অত্যাচারী রাজার জন্য জাহাজ ভর্তি শরাব আনা হচ্ছিলো। এক বুজুর্গ ব্যক্তি ওই পথ দিয়ে

যাচ্ছিলেন। তিনি শরাবের কথা জানতে পেরে জাহাজে উঠে শরাবের পিপেগুলো ভেঙে ফেললেন। একটি মাত্র পিপেকে রাখলেন অক্ষত অবস্থায়। জাহাজের লোকেরা তার কাজে বাধা দেওয়ার সাহস করলো না। সকলে ভাবলো, এ লোক এরকম সাহস পেলো কেমন করে? রাজার কানে যখন একথা পৌঁছলো, তখন সে-ও অবাক হয়ে গেলো। ওই বুজুর্গ ব্যক্তিকে সে তার দরবারে তলব করলো। তিনি নির্ভয়ে উপস্থিত হলেন রাজদরবারে। রাজা বললো. পিপেগুলো ভাঙলে কেনো? তিনি জবাব দিলেন, আমার অন্তরে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রবল সংকল্প উপস্থিত হয়েছিলো, তাই। এখন তুমি ইচ্ছা করলে আমাকে শাস্তি দিতে পারো। রাজা বললো, একটা পিপে বাদ রাখলে কেনো? তিনি বললেন, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য নিয়েই আমি একাজ শুরু করেছিলাম। কিন্তু শেষে এসে দেখলাম, আমার নফস খুব খুশী হয়ে গেলো। একটি নিষিদ্ধ কাজকে উৎখাত করার কৃতিত্ব দাবি করতে লাগলো। আমি ভাবলাম, নফসকে তুষ্ট করলে তো আমার আমল বৃথা যাবে। তাই শেষ পিপেটি আর ভাঙিনি।

দ্বিতীয় ঘটনাঃ ইমাম গায্যালী র. তাঁর এহ্ইয়া উল উলুম গ্রন্থে লিখেছেন, বনী ইসরাইলদের এক সাধক সব সময় আল্লাহ্র ইবাদতে মশগুল থাকতো। একবার একদল লোক তার কাছে অভিযোগ করলো, আমাদের এলাকার কিছু লোক একটি গাছের পূজা করে। একথা শুনে সাধক খুব রাগ হলো। একটি কুঠার হাতে নিয়ে গাছটি কেটে ফেলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। এক স্থানে শয়তান এক বৃদ্ধের রূপ ধরে তার পথরোধ করে দাঁড়ালো। জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাচ্ছো? সাধক বললো, ওই গাছটি কাটতে যাচ্ছি। শয়তান বললো, ওই গাছের সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক। তুমি তোমার ইবাদত বন্দেগী নিয়ে থাকলেই তো ভালো। সাধক বললো, এ কাজও ইবাদত। শয়তান বললো, না। তুমি গাছটি কাটতে পারবে না। দু'জনের মধ্যে লড়াই শুরু হলো। শয়তান পরাস্ত হলো। সাধক তার বুকের উপরে বসে পড়লো। বেগতিক দেখে শয়তান বললো, আচ্ছা, ঠিক আছে। এবার আমাকে ছেড়ে দাও। তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলি। সাধক তাকে ছেড়ে দিলো। শয়তান বললো, একটা কথা বলি, আল্লাহ্তায়ালা তো তোমার উপরে গাছ কাটাকে ফরজ করে দেননি। গাছটি তোমার তো কোনো ক্ষতি করছে না। তুমি তো আর গাছটির ইবাদত করো না। তুমি তো ইবাদত করো আল্লাহ্র। আল্লাহ্র অনেক নবী আছেন। তিনি তো ইচ্ছা করলে তাঁদের কারো দ্বারা গাছটি কেটে ফেলতে পারতেন। সাধক তার এসব কথায় কান দিলো না। পুনরায় লড়াই শুরু হলো। এবারেও শয়তান পরাভূত হলো। সাধক চড়ে বসলো তার বুকের উপরে। শয়তান নতুন ফন্দি আঁটলো। কাকুতি মিনতি করে মুক্ত হলো প্রথমে। তারপর

বললো, কিছু মনে কোরো না। একটা মীমাংসার কথা বলি। যদি মীমাংসায় সম্মত হও, তবে লাভ হবে তোমারই। বলবো? সাধক বললো, বলো। শয়তান বললো, তুমি তো গরীব লোক। অর্থাভাবে কষ্ট পাও। আমি তোমাকে প্রতিদিন তিনটি করে স্বর্ণমুদ্রা দিবো। সকালে শিয়রের কাছে পাবে। এতে করে তোমার প্রয়োজন মিটবে। অতিরিক্ত অর্থ দ্বারা আত্মীয়-স্বজন ও দরিদ্রদেরকে সাহায্য করতে পারবে। দান-খয়রাত করে অনেক সওয়াবও অর্জন করতে পারবে। শর্ত হচ্ছে— গাছটি কাটতে পারবে না। ভেবে দ্যাখো, গাছ কাটলে না হয় একটি সওয়াব পাবে। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হবে না। কারণ বৃক্ষ-পূজকেরা ওই গাছের পরিবর্তে নতুন একটি গাছ লাগাবে। অপকর্ম চালিয়ে যাবে আগের মতোই।

এবার সাধকের মন কিছুটা নরম হলো। শয়তানের যুক্তি তার মনোপুত হলো। তার কথা বিশ্বাস করে বাড়ি ফিরে এলো। সকালে শিয়রের কাছে পেলো তিনটি স্বর্ণমুদ্রা। পরদিনও পেলো। কিন্তু তৃতীয় দিন আর পেলো না। সে ভয়ানক রাগ হয়ে গেলো। কুড়াল নিয়ে চললো গাছ কাটতে। পথে দেখা হলো বৃদ্ধের রূপধারণকারী শয়তানের সঙ্গে। সে বললো, কোথায় যাচ্ছ? সাধক বললো, গাছ কাটতে। শয়তান বললো, পারবে না। দু'জনের মধ্যে শুরু হলো ধ্বস্তাধ্বস্তি। এবার জয়ী হলো শয়তান। সে ওই সাধকের বুকের উপরে চড়ে বসলো। সাধক বিস্মিত হলো। বললো, এবার তুমি জয়ী হলে কেমন করে? শয়তান বললো, আগে তোমার (নিয়ত) ছিলো বিশুদ্ধ— কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি সাধনার্থে গাছ কাটতে বের হয়েছিলে। কিন্তু এখন বের হয়েছো স্বর্ণমুদ্রা না পাওয়ার কারণে। তাই পরাস্ত হয়েছো।

১৪. রসুলে আকরম স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ বলেন, তুমি ফজর ও আসর নামাজের পর সামান্য সময় আমার জিকির করো, আমি তোমার মধ্যবর্তী সময়ের সকল প্রয়োজন পূর্ণ করে দিবো। দুররে মানসুর, আহ্‌মদ।

ব্যাখ্যাঃ এক হাদিসে আছে, আল্লাহ্‌র জিকির করতে থাকো, তোমার সকল প্রয়োজন পূর্ণ হবে। আর এক হাদিসে আছে, রসুলেপাক স. বলেন, যারা ফজরের নামাজের পর থেকে সূর্য ওঠা পর্যন্ত আল্লাহ্‌র জিকিরে মগ্ন থাকে, তাদের সাথে বসা আমার কাছে চারজন গোলাম আজাদ করা অপেক্ষা অধিক মনোপুত। এভাবে আছরের নামাজের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জিকিরকারীদের সঙ্গে উপবেশন আমার কাছে চারজন গোলাম আজাদ করা অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয়।

রসুলেপাক স. আরো এরশাদ করেছেন, ফজরের নামাজের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত কোনো জামাতের সঙ্গে জিকিরে মশগুল থাকা আমার কাছে পৃথিবী ও পৃথিবীর সকল বস্তু অপেক্ষা অধিক প্রিয়। এভাবে আসরের নামাজের পর সূর্যাস্ত

পর্যন্ত কোনো দলের সঙ্গে জিকিরে রত থাকা আমার নিকটে দুনিয়া ও দুনিয়ার সকলকিছু অপেক্ষা অধিক প্রিয়।

এ সকল কারণে ফজর ও আসরের পরে অজিফা পড়া হয়ে থকে। সুফিয়ায়ে কেরাম এই সময়কে অজিফা আদায়ের জন্য খুবই গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। বিশেষতঃ ফজরের পরের সময়টিকে ফকীহ্গণও অত্যন্ত মূল্যবান মনে করেন। ইমাম মালেক র. বলেন, ফজরের নামাজের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত কথা বলা মাকরুহ। হানাফী মাযহাব মতে 'দোররে মোখতার' কিতাবের লেখকও ওই সময় কথা বলাকে মাকরুহ বলেছেন।

১৫. রসুলে আকরম স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্র জিকির ও তার নিকটবর্তী বিষয়াবলী এবং আলেম ও দ্বীনের তালেবে এলেম ছাড়া দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছু অভিশপ্ত। তিরমিজি, ইবনে মাজা, তারগীব।

ব্যাখ্যাঃ এই হাদিসে জিকিরকারী ও তালেবে এলেমগণের মহামর্যাদার কথা বলা হয়েছে। এক হাদিসে আছে, কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে এলেম শিক্ষা করা অর্থ আল্লাহ্কে ভয় করা। আর এলেম অন্বেষণের জন্য কোথাও গমন করা ইবাদত। স্মৃতিস্থ করার চেষ্টা যেমন তসবীহ্ পাঠ। আর তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা জেহাদতুল্য। আর তা পাঠ করা দান-খয়রাতের মতো। যোগ্য পাত্রে তা বিতরণ করা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের মাধ্যম। কেননা এলেমই বৈধ ও অবৈধ বিষয়াবলী চেনার উপায় এবং জান্নাতের পথের নিশানা। নিঃসঙ্গ অবস্থায় সান্ত্বনা প্রদানকারী এবং সফরের সাথী। এভাবে একান্তে আলাপ-আলোচনাকারী এবং সুখে-দুঃখে দলিল। শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র। বন্ধুদের জন্য নিরাপত্তা।

এ সকল কারণে আল্লাহ্তায়ালা দ্বীনদার আলেমগণকে (দুনিয়াদার আলেমগণকে নয়) উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। কেননা তাঁরা হলেন কল্যাণের পথ প্রদর্শক। এমন ইমাম, সশ্রদ্ধচিত্তে যাঁদের অনুসরণ করা হয়, গ্রহণ করা হয় তাঁদের মূল্যবান মতামত। ফেরেশতারা তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে আগ্রহী। বরকত লাভের জন্য অথবা কেবল ভালোবাসা প্রকাশের জন্য তারা তাদের ডানা দিয়ে তাঁদেরকে আদর করে। দুনিয়ার সকল সৃষ্টি তাঁদের মাগফিরাতের জন্য আল্লাহ্র কাছে দোয়া করে। সমুদ্রের মৎস্য, বন্যপ্রাণী, পশুকুল, হিংস্রজন্তু, এমনকি বিষাক্ত সাপও তাঁদের জন্য দোয়া করতে থাকে।

এলেম হচ্ছে অন্তরের আলো, চোখের জ্যোতি। এলেমের কারণেই মানুষ উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়। লাভ করে পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীতে প্রভূত মর্যাদা। এলেম অনুশীলন রোজা তুল্য। আর তা স্মৃতিস্থ রাখা তাহাজ্জুদ পাঠের

মতো। এলেম দ্বারাই হালাল হারাম চেনা যায়। এলেম হচ্ছে আমলের ইমাম। পুণ্যবান ব্যক্তিদেরকেই এলেমের এলহাম করা হয়।

প্রখ্যাত হাদিসবেত্তা হাফেজ ইবনে কাইয়্যিম জিকিরের উপকারিতার বিষয়ে রচিত তাঁর 'আলওয়াবিলুছ ছাইয়্যিব' নামক গ্রন্থে সবিস্তার আলোচনা করেছেন। লিখেছেন, জিকিরের মধ্যে রয়েছে একশতটিরও বেশী উপকারিতা। সেখান থেকে চুয়াত্তরটি উপকারিতার কথা এখানে আমরা উল্লেখ করলাম। যেমন—

১. জিকির শয়তানকে তাড়িয়ে দেয় ও তার শক্তি খর্ব করে।

২. জিকির আল্লাহ্র পরিতোষ লাভের উপায়।

৩. হৃদয়ের বিষণ্নতা দূর করে।

৪. মনে আনে আনন্দ।

৫. উজ্জীবিত ও প্রফুল্ল রাখে হৃদয় শরীরকে।

৬. চেহারা ও অন্তরকে করে জ্যোতির্ময়।

৭. উত্তম রিজিক আকর্ষণ করে।

৮. জিকিরকারীকে প্রভাব ও প্রশান্তির পোশাক পরানো হয়। তাকে দেখলে সমীহবোধ যেমন জাগে, তেমনি জাগে ভালোবাসা।

৯. হৃদয় ভরে দেয় আল্লাহ্র ভালোবাসায়।

১০. জিকিরের দ্বারা লাভ হয় মোরাক্বাবা (ধ্যনমগ্নতা) যা পৌঁছে দেয় এহসানের স্তরে।

১১. সকল বিষয়ে আল্লাহ্ই হন একমাত্র আশ্রয়স্থল।

১২. লাভ হয় আল্লাহ্র নৈকট্য।

১৩. খুলে যায় মারেফতের দরজা।

১৪. অর্জিত হয় আল্লাহ্র ভয়।

১৫. আল্লাহ্ তাকে স্মরণ করেন। যেমন বলা হয়েছে 'ফাজকুরুনী আজকুরকুম' (তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো)। সুরা বাকারা আয়াত ১৫২। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে 'মান জাকারানি ফী নাফসিহি জাকারতুহু ফী নাফসী' (যে আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি)।

১৬. দিলকে জিন্দা করে।

১৭. জিকির হচ্ছে কলব ও রূহের আহার।

১৮. কলবের মরিচা দূর করে দেয়।

১৯. দূর করে দেয় ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ভুল-ভ্রান্তি।

২০. গাফিলতি বা অমনোযোগিতা দূর করে।

২১. বান্দা যে জিকির আজকার করে, তা আরশের চতুর্দিকে ওই বান্দার জিকির করে ঘুরতে থাকে।

২২. সুখের সময় যে জিকির করে, তার দুঃখের সময় আল্লাহ্ তাকে স্মরণ করেন।

২৩. জিকির আল্লাহ্র আযাব থেকে নাজাতের ওসীলা।

২৪. জিকিরের কারণে সাকিনা অবতীর্ন হয়।

২৫. জিকিরের বরকতে জবান গীবত, চোগলখুরী, অসত্য ও অনর্থক কথা থেকে নিরাপদ থাকে।

২৬. জিকিরের মজলিস হচ্ছে ফেরেশতাদের মজলিস।

২৭. জিকিরের বদৌলতে জিকিরকারীর সঙ্গী-সাথীরাও সৌভাগ্যবান হয়।

২৮. কিয়ামতের দিনে জিকিরকারীদের কোনো আক্ষেপ থাকবে না।

২৯. ক্রন্দনকারী জিকিরকারী কিয়ামতের দিনে আল্লাহ্র আরশের ছায়ায় আশ্রয় লাভ করবে।

৩০. দোয়াকারীগণের চেয়ে জিকিরকারীদের অধিক প্রাপ্তি ঘটে। হাদিসে কুদসিতে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালা এরশাদ করেন, আমার জিকিরের কারণে যে দোয়া করার ফুরসত পায় না, আমি তাকে দোয়াকারীদের চেয়ে বেশী দান করি।

৩১. সবচেয়ে সহজ ইবাদত হওয়া সত্ত্বেও জিকির সকল ইবাদতের চেয়ে উত্তম।

৩২. আল্লাহ্র জিকির জান্নাতের ছায়াগাছ।

৩৩. জিকিরের জন্য যে প্রতিদান ও পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, অন্য কোনো আমলের জন্য সেরকম প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি। হাদিস শরীফে বলা হয়েছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহাদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইউহ্য়ী ওয়া ইউমিতু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বদীর' এই দোয়া যদি কেউ দিনে একশত বার পাঠ করে, তবে তাকে দেওয়া হয় দশজন ক্রীতদাস মুক্ত করে দেওয়ার সওয়াব, তার আমলনামায় লিখে দেওয়া হয় একশত নেকি এবং গোনাহ্ মাফ করে দেওয়া হয় একশতটি। আর সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তানের আক্রমণ থেকে হেফাজতে থাকে।

৩৪. নিজের কল্যাণের কথা ভুলে যাওয়ার বিপদ থেকে রক্ষা করে। রোধ করে কলবের মৃত্যুকে।

৩৫. জিকির মানুষের অশেষ উন্নতি সাধন করে। যার কলব জিকিরে জাগ্রত, তার নিদ্রিত অবস্থাও গাফেল রাত্রি জাগরণকারী অপেক্ষা উত্তম।

৩৬. জিকিরের নূর দুনিয়ায় সঙ্গে থাকে, সঙ্গে থাকে কবরেও। আর পুলসিরাতে চলতে থাকবে আগে আগে। রসুলেপাক স. এই নূরের জন্যই প্রার্থনা করতেন এভাবে— হে আমার আল্লাহ্! আমার মাংসে, অস্থিতে, চর্মে, পশমে, কানে, চোখে, উপরে, নিচে, ডানে, বামে, সম্মুখে, পশ্চাতে নূর দান করো। আরো বলতেন, আমার আপাদমস্তক নূরে ভরপুর করে দাও।

৩৭. জিকির তাসাউফ শাস্ত্রের মৌলিক বিষয়গুলির মূল। সকল তরিকার পীর-মোর্শেদগণ এ ব্যাপারে একমত। যার জন্য জিকিরের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে, তার জন্য খুলে গিয়েছে মারেফতের পথ।

৩৮. মানুষের অন্তরে এমন একটি কোণ আছে, যা জিকির ছাড়া অন্য কোনো কিছু দ্বারা পূর্ণ করা যায় না। হৃদয়ের পূর্ণ পরিসর যখন জিকিরে ভরে যায়, তখন ওই বিশেষ কোণটিও ভরপুর হয়ে যায় জিকিরের নূরে। তখন জিকিরকারী সম্পদ ব্যতিরেকেই হয়ে যায় সম্পদশালী। আত্মীয়-স্বজন ও জনবল ছাড়াই লাভ করে প্রভূত সম্মান। সাম্রাজ্য ছাড়াই হয়ে যায় সম্রাট। আর যে জিকির করে না, সে আত্মীয়-পরিজন, বিত্ত-সম্পদ ও রাজত্ব থাকা সত্ত্বেও হয় লাঞ্ছিত ও অপদস্থ।

৩৯. জিকির বিক্ষিপ্ত বিষয়াবলীকে একত্র করে, একত্রকে করে বিক্ষিপ্ত। দূরবর্তীকে করে নিকটবর্তী, আর নিকটবর্তীকে ঠেলে দেয় দূরে। অর্থাৎ হৃদয়ের সকল অসৎভাবনাকে দূরে ঠেলে দিয়ে অন্তরে আনে শান্তি ও আল্লাহ্প্রেম। দুর্ভাগ্যকে করে দূরবর্তী, আর নিকটে এনে দেয় সকল সৌভাগ্যকে।

৪০. জিকির হৃদয়ের ঘুম ভাঙায়। সতর্ক করে।

৪১. জিকির এমন একটি বৃক্ষ, যাতে ফল ধরে মারেফতের। সুফিয়ায়ে কেরাম ওই ফলকে বলেন হাল ও মাকামের ফল। জিকির যতো গভীর হবে, ওই বৃক্ষের শিকড় হবে ততো সুদৃঢ়। ফলও ধরবে বেশী।

৪২. জিকিরকারী আল্লাহ্পাকের সঙ্গী। যেমন আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেন 'ইন্নাল্লাহা মায়াল্লাজীনাত্তাক্বাও' (আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন)। সুরা নাহল, আয়াত ১২৮। হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, আল্লাহ্পাক বলেন 'আনা মাআ' আ'বদি মা জাকারানী' (আমি বান্দার সাথে থাকি, যতক্ষণ সে আমার জিকির করতে থাকে)। এক হাদিসে আছে, আল্লাহ্পাক বলেন, আমার জিকির যারা করে, তারা আমার আপন জন। তাদেরকে আমি কখনোই আমার রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেই না। যদি তারা তওবা করে, তবে আমি তাদের বন্ধু হই। না করলে তাদের চিকিৎসক হই। গোনাহ্ থেকে তাদেরকে পবিত্র করার নিমিত্তে তাদেরকে দুঃখ-কষ্টে ফেলে দেই।

৪৩. জিকির ক্রীতদাস মুক্ত করে দেওয়ার সমতুল। আল্লাহ্‌র পথে অর্থ ব্যয় তুল্য। আল্লাহ্‌র রাস্তায় জেহাদ করার সমান।

৪৪. জিকির শোকরের মূল। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জিকির আদায় করে না, সে আল্লাহ্‌র শোকরও আদায় করে না।

এক হাদিসে আছে, একবার মহাপ্রেমিক মুসা নবী আ. আল্লাহ্‌পাকের উদ্দেশ্যে নিবেদন করলেন, হে আমার প্রিয় প্রভুপালক! তুমি আমার উপরে অসংখ্য এহসান করেছো। সুতরাং আমাকে এমন একটি পদ্ধতি শিখিয়ে দাও, যাতে আমি তোমার অত্যধিক শোকর আদায় করতে পারি। আল্লাহ্‌পাক জানালেন, তুমি যতো বেশী আমার জিকির করবে, ততবেশী হতে পারবে শোকর-গুজার। আরেক হাদিসে আছে, হজরত মুসা বললেন, কীভাবে তোমার মহামর্যাদার অনুকূল কৃতজ্ঞচিত্ততা প্রকাশ করবো? আল্লাহ্‌ বললেন, তোমার রসনা যেনো আমার জিকিরে সদা সিক্ত থাকে।

৪৫. পরহেজগার লোকদের মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে তারাই অধিক সম্মানিত, যারা সব সময় জিকিরে মশগুল থাকে। কেননা তাকওয়ার শেষ ফল জান্নাত। আর জিকিরের শেষফল আল্লাহ্‌র নৈকট্য।

৪৬. দিলের মধ্যে এক ধরনের এমন কাঠিন্য আছে, যা জিকির ছাড়া অন্য কিছুতে নম্র হয় না।

৪৭. জিকির সকল রোগের চিকিৎসা।

৪৮. আল্লাহ্‌র সঙ্গে বন্ধুত্বের মূল হলো জিকির। আর তাঁর সাথে শত্রুতার মূল– গাফলত।

৪৯. জিকিরের মতো নেয়ামত আকর্ষণকারী ও আযাব দূরকারী কিছু নেই।

৫০. জিকিরকারীদের সাথে আল্লাহ্‌র রহমত এবং ফেরেশতাবৃন্দের দোয়া থাকে।

৫১. জিকিরের জলসাসমূহ জান্নাতের বাগান।

৫২. জিকিরের জলসা ফেরেশতাদের জলসা।

৫৩. আল্লাহ্‌পাক তাঁর জিকিরকারীদের বিষয়ে ফেরেশতাদের সমাবেশে গর্ব প্রকাশ করেন।

৫৪. সর্বদা জিকিরকারী হাসতে হাসতে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

৫৫. যাবতীয় আমলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জিকিরের জন্যই।

৫৬. সেই আমলই সর্বোত্তম, যার মধ্যে আল্লাহ্‌র জিকির থাকে। যেমন জিকিরময় নামাজ, জিকিরময় রোজা, জিকিরময় জাকাত, জিকিরময় হজ্ব, জিকিরময় জেহাদ ইত্যাদি।

৫৭. হাদিস শরীফে এসেছে, একবার একদল দরিদ্র সাহাবী রসুলেপাক স. এর মহান সাহচর্যে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আমাদের প্রিয়তম রসুল! বিত্তবানেরা তাদের বিত্তের কারণে হজ্ব, ওমরা, জাকাত ও জেহাদের আমলগুলো করার সুযোগ পায়। এভাবে তারা পুণ্যের দিক দিয়ে হয়ে যায় অধিক অগ্রগামী। রসুলেপাক স. বললেন, আমি তোমাদেরকে একটি সহজ আমলের কথা বলে দেই। তোমরা নামাজের পর 'সুবহানাল্লাহ্' 'আলহামদুলিল্লাহ্' ও 'আল্লাহু আকবর' বেশী করে পড়ো। তাহলে তোমরাও পুণ্যার্জনের ক্ষেত্রে পেছনে পড়ে থাকবে না।

৫৮. জিকির অন্যান্য ইবাদত পালনের সহায়ক। জিকির ইবাদতে আস্বাদ আনয়ন করে। সকল ইবাদতকে সহজ করে দেয়।

৫৯. জিকিরের কারণে সকল কষ্টদায়ক কাজ সহজসাধ্য হয়ে যায়। সকল মুসিবত দূর হয়ে যায়।

৬০. যত জিকির করবে, ততোই মন থেকে ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাবে। মনে আসবে শান্তি।

৬১. হজরত ফাতেমা তুয্ যাহরা রা. আটা পেষা, কুয়া থেকে পানি তোলা— এ সকল কষ্টকর গৃহকর্ম করতেন। তিনি রসুলেপাক স. এর কাছে এসকল কাজের জন্য একজন পরিচারক চেয়েছিলেন। তিনি স. তাঁকে রাতে শয্যাগ্রহণের প্রাক্কালে ৩৩ বার সোবহানাল্লাহ্, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ্ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবর পাঠ করার নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, এই আমল খাদেম লাভ করার চেয়ে উত্তম।

৬২. পরবর্তী পৃথিবীর কল্যাণের জন্য শ্রম স্বীকারকারী সকলেই দৌড়াচ্ছে। তাদের মধ্যে জিকিরকারীগণ রয়েছেন সকলের সামনে।

৬৩. জিকিরকারীদেরকে আল্লাহ্পাক 'সত্যবাদী' বলেন। আর যাদেরকে আল্লাহ্পাক সত্যবাদী বলেন, মিথ্যাবাদীদের সঙ্গে কখনোই তাদের হাশর হতে পারে না।

৬৪. জিকির দ্বারা জান্নাতে গৃহ নির্মাণ করা হয়। বান্দা যখন জিকির বন্ধ করে দেয়, তখন ফেরেশতাদের নির্মাণকর্মও থাকে বন্ধ। তাদেরকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলে, নির্মাণ কাজের খরচ এখনো এসে পৌঁছেনি। এক হাদিসে এসেছে, যে ব্যক্তি 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আজীম' সাতবার পাঠ করে, বেহেশতে তার জন্য একটি সবুজ গম্বুজ তৈরী হয়ে যায়।

৬৫. জিকির দোজখের দিকের প্রাচীর। কোনো খারাপ আমলের কারণে দোজখ নির্ধারিত হলেও জিকির মাঝখানে প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়।

৬৬. ফেরেশতারা জিকিরকারীদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে। হজরত আমর ইবনে আস রা. কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, বান্দা যখন 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' বলে অথবা বলে 'আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন' তখন ফেরেশতারা বলে, হে আল্লাহ্! এই লোকটিকে মাফ করে দাও।

৬৭. কোনো পাহাড়ে বা প্রান্তরে আল্লাহ্র জিকির করা হলে তারা গর্ববোধ করে। এক পাহাড় অন্য পাহাড়কে ডেকে বলে, আজ তোমার উপর দিয়ে কোনো জিকিরকারী পথ অতিক্রম করেছে কি? পাহাড়টি হ্যাঁ বললে প্রশ্নকারী পাহাড়টি আনন্দিত হয়।

৬৮. অত্যধিক জিকির মুনাফিকি থেকে মুক্তিপ্রদায়ক। আল্লাহ্পাক মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেন 'লা ইয়াজকুরূনাল্লাহা ইল্লা ক্বলীলা' (আল্লাহ্কে তারা অল্পই স্মারণ করে)। সুরা নিসা, আয়াত ১৪২। হজরত কা'ব আহবার রা. বলেন, যে বেশী বেশী জিকির করে, সে মুনাফিকি থেকে মুক্ত।

৬৯. জিকিরের স্বতন্ত্র স্বাদ আছে, যা অন্য কোনো আমলে নেই। অন্য কোনো ফযীলত যদি নাও থাকতো, তবুও জিকির ওই আস্বাদের কারণে হতো অনন্য।

৭০. পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবী— উভয় স্থানে জিকিরকারীদের চেহারায় জ্বল জ্বল করে নূর।

৭১. যে ব্যক্তি পথে ঘাটে ঘরে বাইরে দেশে বিদেশে অত্যধিক জিকির করবে, কিয়ামত দিবসে তার পক্ষে সাক্ষ্যদানকারীদের সংখ্যা হবে অনেক বেশী। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেন 'ইয়াওমাইজিন তুহাদ্দিছু আখবারাহা' (সেই দিন পৃথিবী তাহার বৃত্তান্ত বর্ণনা করিবে)। সুরা যিল্যাল, আয়াত ৪।

রসুলেপাক স. এরশাদ করেন, জমিনের খবরা-খবর তোমরা জান কি? সাহাবীগণ তাঁদের অজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। তিনি স. বললেন, কোনো স্থানে কোনো পুরুষ ও রমণী কিছু করলে, ওই স্থানের মাটি সে সম্পর্কে বলবে (ভালো-মন্দ যাই হোক না কেনো)। একারণেই বিভিন্ন স্থানে জিকিরকারীদের সাক্ষ্যদানকারী হবে বেশী।

৭২. জবান যতক্ষণ আল্লাহ্র জিকিরে রত থাকবে, ততক্ষণ মিথ্যা কথা, গীবত, বাচালতা এসব কিছু করতে পারবে না। দিলের অবস্থাও তদ্রূপ। হয় আল্লাহ্র স্মরণে নিমগ্ন হবে, না হয় মত্ত হবে মাখলুকের জিকিরে।

৭৩. শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন। জিকির ছাড়া অন্য কোনো কৌশল-বুদ্ধি, শক্তি প্রয়োগ করে তাকে কলব থেকে হঠানো যায় না। শয়তান তাড়ানোর একমাত্র অস্ত্র জিকির (কলবী জিকির)।

৭৪. রসুলেপাক স. বলেন, প্রত্যেক জিনিসকে পরিষ্কার করার যন্ত্র রয়েছে, দিলের ময়লা পরিষ্কার করার যন্ত্র হলো আল্লাহ্‌র জিকির এবং আল্লাহ্‌র আজাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জিকির অপেক্ষা অধিক কার্যকরী আর কিছুই নেই। এই হাদিস দ্বারাও জিকিরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

কেননা প্রত্যেক ইবাদত প্রকৃত ইবাদতে গণ্য হয় অন্তর পরিষ্কার থাকলে। এই জন্যই সুফীগণ এর অর্থ আন্তরিক জিকির সাব্যস্ত করেছেন, মৌখিক জিকির নয়। অন্তরকে সর্বদা আল্লাহ্‌র সাথে সংযুক্ত রাখার নামই হলো আন্তরিক জিকির আর মানুষ যখন এই পর্যায়ে উপনীত হয়, তখন তার আর কোনো ইবাদত বাদ পড়তে পারে না। যেহেতু জাহেরী এবং বাতেনী সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই অন্তরের অধীন। অন্তর যার সাথে মিলে যায়, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই তার সঙ্গে মিশে যায়। প্রেমিকের অবস্থার কথা কে না জানে? হজরত সালমান ফারসী রা. কে কেউ জিজ্ঞেস করেছিলো, সর্বশ্রেষ্ঠ আমল কী? তিনি বলেছিলেন, তুমি কি কোরআন পড়োনি? কোরআনে পরিষ্কার বর্ণিত আছে—

وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ -

(আল্লাহ্‌র জিকিরই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ)। সুরা আনকাবূত, আয়াত ৪৫। সুতরাং জিক্‌রে এলাহী হতে উত্তম আর কিছুই হতে পারে না। হজরত সালমান ফারসী রা. উপরোল্লেখিত আয়াতের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। 'মাজালেছুল আবরার' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, এই হাদিস দ্বারা আল্লাহ্‌র জিকিরকে সদ্‌কা, জেহাদ এবং সমস্ত ইবাদত হতে এই জন্য শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে যে, আসল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্‌র জিকির, আর বাকী সব ইবাদত হলো জিকির হাসেল করার উপকরণ। আবার জিকিরও দুই প্রকার। প্রথম মৌখিক জিকির, দ্বিতীয় আন্তরিক জিকির— এটাই শ্রেষ্ঠ জিকির। ফিকির ও মোরাক্বাবা একেই বলা হয়। ওই হাদিসের মর্মও এটাই, যেমন বর্ণিত হয়েছে, 'ফিক্‌রাতু ছায়া'তান খইরুম্‌ মিন ইবাদাতি সিত্‌তিনা সানাহ্‌' (এক ঘণ্টার মোরাক্বাবা ষাট বছর ইবাদত করার চেয়ে উত্তম)।

'মুসনাদে আহ্‌মদ' নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে, আল্লাহ্‌র জিকির আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করার চেয়ে সাতলক্ষ গুণ বেশী ফযীলত রাখে।

তৃতীয় অধ্যায়

পর্যালোচনাঃ এক

এতোক্ষণের আলোচনায় এ বিষয়টি নিশ্চয়ই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে, জিকির করতে হবে সকল সময়। আর সকল সময় জিকির কলব দ্বারাই করা সম্ভব— মুখের দ্বারা নয়। কীভাবে হবে? মুখ দ্বারা আমাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলতে হয়। চাকুরী-ব্যবসা করতে হয়। বক্তৃতা- বিবৃতি-নির্দেশনা দিতে হয়। এ সকল কিছু না করলে আমাদের জীবন, সংসার, পৃথিবী অচল হয়ে পড়বে। তাছাড়া পান ও ভোজন মুখের দ্বারাই তো করতে হয়। আরো আছে বিশ্রাম, নিদ্রা। বিশ্রাম ও নিদ্রার সময় মুখকে বন্ধ রাখতে তো আমরা বাধ্য।

বিষয়টি নিয়ে আমরা আর একটু ভেবে দেখি। আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালা আমাদেরকে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়েছেন। সেগুলির প্রত্যেকটির কাজ ভিন্ন ভিন্ন। যেমন চোখের কাজ দেখা, কানের কাজ শোনা, হাতের কাজ ধরা, পায়ের কাজ পথ চলা, মস্তিষ্কের কাজ বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা করা, মুখের কাজ কথা বলা ইত্যাদি। তেমনি আল্লাহ্র জিকির করবার জন্য (জিকির স্থাপন করবার জন্য) আমাদের প্রত্যেককে দিয়েছেন কলব। এই কলব দ্বারাই আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে (ইমান আনতে হবে), আল্লাহ্কে ভয় করতে হবে, আল্লাহ্র রহমতের আশা করতে হবে, আল্লাহ্কে ভালোবাসতে হবে এবং আল্লাহ্কে স্মরণ করতে হবে।

প্রথমে খুলতে হবে কলবের তালা। জিকিরের চাবি ছাড়া এই তালা খোলা যায় না। হাদিস শরীফের মাধ্যমে আমরা এই শিক্ষাই পাই। যেমন রসুলে আকরম স. তাঁর প্রার্থনায় বলতেন 'হে আমার আল্লাহ্! তোমার জিকির দ্বারা আমাদের কলবের তালাগুলো খুলে দাও। কানযুল উম্মাল।

এভাবে জিকির দ্বারা কলবের গৃহে প্রবেশ করতে হবে। আবার জিকির দ্বারাই ওই গৃহ থেকে শয়তানকে উৎখাত করতে হবে। আমরা ইমানদার। আমরা আল্লাহ্কে ভালোবাসি। সুতরাং আল্লাহ্র দুশমন শয়তানকে আমাদের হৃদয়ে স্থান দিতে পারি না। আল্লাহ্পাক সাবধান করে দিয়েছেন

وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ -

(শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিও না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু)। সুরা বাকারা, আয়াত ২০৮। আমাদের দয়াল নবী স. সতর্ক করে দিয়েছেন একথা

বলে ‘জেনে রেখো, নিশ্চয়ই শরীরের মধ্যে রয়েছে একটি মাংসপিণ্ড, ওই মংসপিণ্ডটি শুদ্ধ হলে সমস্ত শরীর শুদ্ধ হয়ে যায়, আর ওইটি অশুদ্ধ হলে সমস্ত শরীর হয়ে যায় অশুদ্ধ। সাবধান! ওইটাই ক্বলব। বোখারী, মুসলিম, তিরমিজি, আবু দাউদ, নাসাঈ। অর্থাৎ কলব ঠিক হলে সমস্ত আমল আখলাক ঠিক হয়ে যায়। আর তা নষ্ট হলে সমস্ত আমল আখলাক হয়ে যায় নষ্ট।

রসুলে আকরম স. আরো এরশাদ করেছেন, ‘আশ্‌শাইত্বনু জাছিমুন আলা ক্বলবি ইবনে আদামা- ফাইজা জাকারাল্লহা খানাসা ওয়া ইজা গফালা ওয়াস্‌ওয়াসা’ (শয়তান আদমসন্তানগণের কলবে মজবুতভাবে বসে থাকে— যদি কলবে জিকির করা হয়, তবে সে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। আর যদি কলব জিকির থেকে গাফেল থাকে, তবে সে আবার কলবে বসে দিতে থাকে কুমন্ত্রণা)। বোখারী, মেশকাত। একথার অর্থ শয়তান সকল মানুষের কলবে বসে থাকে। আলেম-বেআলেম, নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, শাদা-কালো, দেশী-বিদেশী সকলের কলবেই সে বসে থাকে। বসে থাকতে পারে না কেবল ওই লোকের কলবে, যার কলবে রয়েছে জিকির। বলা বাহুল্য, এই জিকির হতে হবে নিরবচ্ছিন্ন। নয়তো শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে স্থায়ীভাবে নিরাপদ হওয়া যাবে না।

একটি প্রশ্নঃ পৃথিবীতে এতো সুন্দর মনোরম জায়গা থাকতে শয়তান মানুষের কলবে উপবেশন করে কেনো? সাধারণ দৃষ্টিতে আমরা এর কোনো কারণ খুঁজে পাই না। কিন্তু একটু গভীরভাবে ভাবলেই আমরা বুঝতে পারি— আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদেরকে কলব দিয়েছেন ইমান আনবার জন্য, জিকির দ্বারা কলবকে পরিশুদ্ধ করবার জন্য এবং পরিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে (ইখলাসের সঙ্গে) আল্লাহ্‌র ইবাদত করে আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন হবার জন্য, আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি থেকে মুক্তি পাবার জন্য। কিন্তু শয়তান চায় আমরা আমাদের ইমানকে বিনষ্ট করি, আল্লাহ্‌র জিকির ভুলে যাই। এভাবে শয়তানের কুমন্ত্রণায় ভুলে তার সাথে পথ চলতে থাকি জাহান্নামের দিকে। শয়তান জানে, আমাদের সকল বাহ্যিক কর্মকাণ্ড কলবের নিয়ন্ত্রণে। তাই সে কেবল কলবকেই নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়। বাইরের দিক থেকে শক্তি প্রয়োগ করার প্রয়োজন বোধ করে না। সকল অবিশ্বাসী পাপীষ্ঠের কলব তার নিয়ন্ত্রণে। তার এই নিয়ন্ত্রণ যতো প্রলম্বিত হবে ততোই আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকবো। আমাদের কলব গোনাহ্‌গার হবে, গোনাহ্‌র কালো কালো দাগ পড়ে কলব অন্ধকারাচ্ছন্ন হতে থাকবে, অন্ধ হবে। এ বিষয়ে কোরআনুল করীমে এরশাদ এসেছে—

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ -

(বস্তুত চক্ষু তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হইতেছে বক্ষস্থিত হৃদয়)। সুরা হাজ্জ্ব, আয়াত ৪৬।

শয়তান-নিয়ন্ত্রিত কলব আরো বহুভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেমন—

كَذٰلِكَ نَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ -

(এইভাবে আমি সীমালংঘনকারীদের কলব মোহর করিয়া দেই)। সুরা ইউনুস, আয়াত ৭৪।

وَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ -

(উহাদের অন্তর মোহর করা হইয়াছে, ফলে উহারা বুঝিতে পারে না)। সুরা তওবা, আয়াত ৮৭।

وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ -

(আল্লাহ্ উহাদের অন্তর মোহর করিয়া দিয়েছেন, ফলে উহারা বুঝিতে পারে না)। সুরা তওবা, আয়াত ৯৩।

وَنَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ -

(আর আমি তাহাদের হৃদয় মোহর করিয়া দিব, ফলে তাহারা শুনিবে না)। সুরা আ'রাফ, আয়াত ১০০।

এই ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত কলবের অধিকারীর জন্যই আল্লাহ্পাক নির্ধারণ করে রেখেছেন জাহান্নাম। যেমন বলেছেন,

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ۖ وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ۖ وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ -

(আমি তো বহু জ্বিন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তদ্দ্বারা তাহারা উপলব্ধি করে না, তাহাদের চক্ষু আছে তদ্দ্বারা দেখে না এবং তাহাদের কর্ণ আছে তদ্দ্বারা শ্রবণ করে না; ইহারা পশুর ন্যায়, বরং উহারা অধিক বিভ্রান্ত। উহারাই গাফেল)। সুরা আ'রাফ, আয়াত ১৭৯।

যে মানুষ বুঝতে পারে যে, সে বিপদকবলিত হয়েছে, সে বিপদ থেকে মুক্ত হতে চেষ্টা করে। কিন্তু যে একথা বুঝতে পারে না, সে তো মুক্তির চেষ্টাও করবে না। আমাদের হয়েছে সেই দশা। আমরা শয়তানকে কলবে রেখেই ইবাদত বন্দেগী করার চেষ্টা করছি। নামাজ পাঠ করছি। কিন্তু নামাজে হুজুরী (একাগ্রচিত্ততা) আছে কিনা, তার খোঁজ নিচ্ছি না। একবারও ভেবে দেখছিনা যে, মনোযোগ ছাড়া, মনের সংযোগ ছাড়া, দুনিয়া-আখেরাতের কোনো কাজই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে না। বিদ্যা অর্জন করতে পারে না অমনোযোগী ছাত্র, অর্থ উপার্জন করতে পারে না অমনোযোগী ব্যবসায়ী, নির্ধারিত দায়িত্ব সুসম্পন্ন করতে পারে না উদাসীন চাকুরীজীবি। ফসল ঘরে তুলতে পারে না অন্যমনস্ক কৃষক। উল্লেখ্য, পৃথিবীর কাজের চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে আখেরাতের কাজ। আর আখেরাতের কাজের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ হচ্ছে নামাজ। এই কাজ সুসম্পন্ন করতে হলে আমাদেরকে তো হতে হবে আরো বেশী মনোযোগী। হুজুরী কলব তো লাগবেই।

আমাদের প্রতিটি কাজের একটি উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যস্থল থাকে। যেমন আমরা বিদ্যালয়ে যাই বিদ্যাশিক্ষার জন্য, ব্যবসা বাণিজ্য করি অর্থোপার্জনের জন্য, বিবাহ করি সন্তান-সন্ততি লাভের জন্য। তেমনি আমাদের নামাজের উদ্দেশ্যও আল্লাহ্ই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। নির্দেশ করেছেন 'আক্বিমিস্ সলাতি লি জিক্‌রি' (নামাজ প্রতিষ্ঠা করো আমার স্মরণার্থে)। আমরা নামাজ পড়লাম। কিন্তু আমাদের অন্তরে উদয় হতে লাগলো পৃথিবীর বিভিন্ন কথা, স্মৃতি-বিস্মৃতি। স্মরণ করতে লাগলাম বিভিন্ন মধুর-অমধুর ঘটনা। এতে করে কী আল্লাহ্‌র কথা 'আমার স্মরণার্থে' প্রতিপালিত হলো। আল্লাহ্‌পাক যে আমল যে ভাবে করতে বলেছেন, সেভাবে না করে অন্যভাবে করলে কী তা গৃহীত হবে?

একটু তলিয়ে দেখলেই আমরা বুঝতে পারবো আমাদের অন্যান্য ইবাদতের অবস্থাও সেরকম। যেমন কোরআন তেলাওয়াত করি— কিন্তু এর দ্বারা উপকৃত হই না। কারণ আমাদের কলব অশুদ্ধ। আমরা অজু গোসল করে শরীরকে পবিত্র করি, কিন্তু কলবকেও যে পবিত্র করতে হবে সেকথা ভুলে যাই। কলবকে শুদ্ধ ও পবিত্র করতে হয় আল্লাহ্‌র জিকির দ্বারা। যে কলব শুদ্ধ ও পবিত্র, সেই কলবে থাকে তাক্বওয়া। আর তাক্বওয়া যারা অবলম্বন করেছে, কোরআন দ্বারা তারাই পায় হেদায়েত। যেমন আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেন 'হুদাললিল মুত্তাক্বীন (এই কোরআন পথপ্রদর্শক মুত্তাক্বীদের জন্য)।

আমাদের ধ্যান-জ্ঞান চিন্তা-ভাবনা সব কিছু বাহিরকে নিয়ে। শয়তান আমাদেরকে আত্মবিশ্লেষণের পথে যেতে দিচ্ছেই না। আমাদের ধর্মীয় পঠন-পাঠন

ওয়াজ-নসিহত বক্তৃতা-বিবৃতি সবকিছুই বাহিরকে নিয়ে। আমরা এলেম শিখছি, আমলও করছি— কিন্তু ইখলাসের কথা ভাবছিনা। আমাদের এলেম ও আমলের সঙ্গে খুলুসিয়াতের (বিশুদ্ধ সংকল্পের) সংযোগ না থাকলে আমাদের ইবাদত যে আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হবে না— এই মূল বয়ান-বিবৃতিটি সম্পর্কে আমরা বেখবর। শয়তান তো চায়, আমরা তার মতো হই। তার মতো অনেক এলেম সংগ্রহ করি। অনেক ইবাদত করি। শয়তান তো আলেম— ফেরেশতাদের শিক্ষক (মুয়াল্লিমুল মালাকুত)। আর সে তো ছিলো আবেদও। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে ইবাদত করেছিলো সে। কিন্তু শেষ ফল কী হলো। চিরদিনের জন্য সে হলো অভিশপ্ত। কী কারণে? কারণ, তার ইখলাস ছিলো না। কলব শুদ্ধ ছিলো না। কলবে ছিলো হিংসা, লোভ, অহংকার। তাই সে তার এলেম ও আমল দ্বারা উপকৃত হয়নি। হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত।

শয়তান চায়— আমরা অনেক এলেম, অনেক আমলের কথা বলি। অনেক ফযীলতের কথা বলি। এভাবে বাইরে বাইরে আমলের পরিমাণ বাড়াতে থাকি। কলবের কথা যেনো না বলি। সে যে আমাদের কলবে বসে থাকে— একথা কাউকে না জানাই। আমাদের জাহেরকে শুধু ঠিক করতে থাকি। বাতেনের কথা না ভাবি। মজে থাকি সওয়াবের কাল্পনিক হিসাব নিয়ে। কিন্তু আমরা তো দেখতে পাচ্ছি— কোরআন ও হাদিসের মূল কথাই হচ্ছে খুলুসিয়াত (বিশুদ্ধতা)। যেমন আল্লাহ্‌পাক বলেন,

اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ -

(সাবধান! আল্লাহ্‌র জন্য বিশুদ্ধ দ্বীন আবশ্যক)। সুরা যুমার, আয়াত ৩। বিশুদ্ধ দ্বীন নির্ভর করে বিশুদ্ধ কলবের উপর। ইতোপূর্বে একথা বলা হয়েছে। আর সওয়াবও দেওয়া হয় কলবে। যেমন হাদিস শরীফে এসেছে, হজরত আনাস রা. বর্ণনা করেন, রসুলে আকরম স. বলেছেন, যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ বলেছে, আর যার কলবে একটি যবের দানা পরিমাণ নেকি থাকে, তাকে দোজখ থেকে বের করা হবে। আর যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ বলে এবং তার কলবে অণুপরিমাণ পুণ্য থাকে, তাকেও দোজখ থেকে বের করে আনা হবে। বোখারী।

যারা কোটি কোটি সওয়াবের হিসাব করতে থাকেন, তারা কি এবার বুঝতে চেষ্টা করবেন, যদি কলবকে শয়তানমুক্ত না করা যায়, তবে রাশি রাশি নেক আমল করেও কোনো পুণ্যপ্রাপ্তি ঘটে না। পাত্র ছাড়া যেমন কোনো কিছু রাখা যায় না; তেমনি বিশুদ্ধ ও প্রশস্ত কলব ছাড়া সওয়াবও জমা হতে পারে না। ইমানদারদের কলবে যে নেকি জমা হয়, সেই নেকির হিসাবই কেরামান কাতেবীনরা লেখেন।

‘মাদারেজুন্ নবুওয়াত’ কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে, রসুলে আকরম স. ছিলেন জামে কালামের অধিকারী। অর্থাৎ তাঁর কথা-বক্তৃতা ছিলো সংক্ষিপ্ত, অথচ গভীর ও ব্যাপক মর্মসমৃদ্ধ। একখানি হাদিস হচ্ছে এরকম— ‘ইন্না মাল আ’মালু বিন্ নিয়্যাত’ (নিশ্চয় আমল নির্ভর করে নিয়তের উপর)। এই হাদিসখানি দ্বীনের ভিত্তিসমূহের মধ্যে এক সুমহান ভিত্তি। উক্তিখানি সবচেয়ে পুর্ণাঙ্গ ও সর্বাধিক ফলদায়ক। কোনো কোনো মহৎব্যক্তি এই হাদিসকে দ্বীনি এলেমের এক তৃতীয়াংশ বলে থাকেন। যেহেতু দ্বীনের মূল অংশ তিনটি— কথা, কাজ ও নিয়ত। আবার কেউ কেউ একে দ্বীনি এলেমের অর্ধেক বলে থাকেন। বলেন এ কারণে যে, আমল দুই ধরনের— কলবের এবং দেহের। কলবী আমলের মধ্যে নিয়তই প্রধান। আবার এভাবে বিচার করলে নিয়তকে দ্বীনের সম্পূর্ণ এলেম বলা যেতে পারে— নিয়ত হচ্ছে কলবী আমল, দৈহিক আমল ও সমস্ত ইবাদতের মূল ভিত্তি।

হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, ‘এলেম অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ ও রমণীর জন্য ফরজ’। আবার বলা হয়েছে— এলেম দুই প্রকার— এক প্রকার, যা শুধু জিহবা পর্যন্ত সীমিত থাকে, অন্তরে কোনো প্রভাব ফেলে না, কিয়ামতের দিন এরকম এলেম ওই আলেমের বিরুদ্ধে কঠিন প্রমাণস্বরূপ হবে। আর দ্বিতীয় প্রকার এলেম, যা অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে— উহাই উপকারী এলেম।

যা অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে, তাকেই কলবী এলেম বলা হয়। এই এলেমকেই এখানে উপকারী এলেম বলা হয়েছে। কারণ এই এলেম কলবে জমা থাকে, আর এর দ্বারা আখেরাতে উপকার পাওয়া যায়। যেমন— আখেরাতের প্রথম মনজিল কবরে আমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে ‘মান রব্বুকা’ (তোমার প্রভুপালক কে)। প্রশ্নটির উত্তর কতো সোজা। কিন্তু সবাই প্রশ্নটির জবাব দিতে পারবে না। পারবে কেবল তারা, যাদের কলবে আল্লাহ্র জিকির আছে। যারা কলবী এলেম জানে। কেননা আখেরাতের জগত কলবেরই জগত।

কালাম পাকে বলা হয়েছে— ‘এবং অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে’। সুরা আ’দিয়াত, আয়াত ১০। অর্থাৎ অন্তরে আল্লাহ্র জিকির থাকলে ওই জিকিরই প্রকাশিত হবে। কিন্তু যাদের কলবে জিকির নেই, তাদের কলব থেকে তখন জবাবই বের হবে না।

সুতরাং সাবধান! এখানেই নিজ নিজ আমল পূর্ণ ও পরিশুদ্ধ করতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ্পাকের জিকিরে পূর্ণ, শুদ্ধ ও পবিত্র করতে হবে কলবকে। আখেরাতে আমরা কীভাবে সফল হবো সেকথা আল্লাহ্পাক আমাদেরকে জানিয়েই দিয়েছেন। বলেছেন,

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّ لَا بَنُوْنَ - اِلَّا مَنْ اَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ -

(যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি কোন কাজে আসিবে না; সেদিন উপকৃত হইবে কেবল সে, যে আল্লাহর নিকট আসিবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ লইয়া)। সুরা শুআরা, আয়াত ৮৯।

পর্যালোচনাঃ দুই

আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালা এরশাদ করেন—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَاۤفَّةً -

(হে মু'মিনগণ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর)। সুরা বাকারা, আয়াত ২০৮।

একথার অর্থ— তোমাদের বাহির ও ভিতর উভয় দিক ইসলামের অধীনে নিয়ে এসো। নিয়ে এসো শরীরকেও। কলবকেও।

আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ অবশ্যমান্য। তিনি আমাদেরকে পূর্ণ (কামেল) হতে বলেছেন। অথচ আমরা অনেকেই এখনো নাকেস (অপূর্ণ) হয়ে আছি। শরীয়তের বাইরের দিকের আমল করে পরিতৃপ্ত আছি। শরীয়তের ভিতরের দিকের (হকিকতের) আমলের প্রতি আগ্রহী হচ্ছি না। এভাবে 'উদখুলূ ফিস্ সিলমি কাফ্ফা' এই হুকুমকে আমান্য করে চলেছি। আমরা শরীয়তের অর্থই বুঝতে পারছি না। শরীয়তের সুরত (আকৃতি) কেই মনে করছি পূর্ণ শরীয়ত। শরীয়তের হকিকত (তত্ত্ব) কী, তা আমলে নিচ্ছি না। অথচ আল্লাহ্পাক আমাদেরকে পুরোপুরি শরীয়তের পাবন্দ হতে নির্দেশ দিচ্ছেন। আরো সাবধান করে দিচ্ছেন—

وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ -

(তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হইয়া কোন অবস্থায় মরিও না')। সুরা আলে ইমরান, আয়াত ১০২।

ইমাম মালেক বলছেন, যে ব্যক্তি তাসাওফ (মারেফত) শিক্ষা ক'রে আমল করে, পক্ষন্তরে ফেকাহ্ (শরীয়ত) ত্যাগ করে, সে জিন্দিক (কাফের), আর যে ব্যক্তি ফেকাহ্ (শরীয়ত) আমল করে, পক্ষান্তরে তাসাওফ (মারেফত) ত্যাগ করে, সে ফাসেক। কিন্তু যে ব্যক্তি দুটোই শিক্ষা ক'রে আমল করে, সেই মুহাক্কিক দ্বীন হাসিল করে।

আমাদেরকে তো মুহাক্কিক দ্বীন বা সত্য দ্বীনই হাসিল করতে হবে। শরীয়তের সুরতের সাথে হাসিল করতে হবে শরীয়তের হকিকতকে। খেয়াল

রাখতে হবে, হাকিকত অর্থ শরীয়তের হকিকত— শরীয়ত থেকে আলাদা কিছু নয়। আরও বুঝতে হবে, সুরতের সঙ্গে হকিকতের সংযোগ ঘটাতে গেলে যে কোনো পদ্ধতি, উপায় বা অবলম্বনকে গ্রহণ করতে হবে। এর নামই তরিকা। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ালো— তরিকত হচ্ছে, শরীয়তের বাহ্যিক সৌন্দর্যের সঙ্গে অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যকে মেলানোর নিয়ম বা পদ্ধতি— জবানী এলেমকে কলবী এলেমের রঙে রঞ্জিত করার পথ বা পন্থা। অন্য কিছু নয়। অর্থাৎ শরীয়তের বাইরের কোনো বিষয় নয়। কেনো হবে। শরীয়তই মানুষের সকল সৌন্দর্যপ্রাপ্তির জিম্মাদার। ইহ-পরকালের সকল সৌন্দর্য ও সৌভাগ্য কেবল শরীয়ত মান্য করার ফলেই পাওয়া যাবে। শরীয়তের ভিতরে রয়েছে সকল প্রকার কল্যাণ, সৌন্দর্য, উৎকর্ষ, শুভফল ও মুক্তি। আর সব ধরনের নষ্টতা, ভ্রষ্টতা, ব্যর্থতা, অপদস্থতা, অকল্যাণ, অসৌন্দর্য রয়েছে শরীয়তের বাইরে। তাই শরীয়তের পরিপূর্ণ পাবন্দিই হতে হবে আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য। আমাদেরকে হতে হবে পুণ্যাভিসারি, পূর্ণ।

একজন মানুষ যেমন এক পা নিয়ে দাঁড়াতে পারে না, চলতে পারে না— একটি পাখি যেমন একটি ডানা নিয়ে উড়তে পারে না, তেমনি শরীয়তের একটি দিকের আমল করে সিরাত্বল মুস্তাক্বিমের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা যায় না। আল্লাহ্পাকের মহব্বত-মারেফাতের আকাশে উড়াল দেওয়া তো যায়ই না। কোনো সামগ্রী ক্রয় করতে হলে তার পূর্ণ মূল্যই পরিশোধ করতে হয়। অর্ধেক মূল্য পরিশোধ করলে চলে না। তেমনি আখেরাতের সামগ্রী— সওয়াব, নাজাত পেতে হলেও পরিশোধ করতে হবে পূর্ণ মূল্য— শরীয়তের পূর্ণ পাবন্দি ।

আমাদেরকে জবানী এলেম অর্জন করতে হবে আলেমগণের কাছ থেকে, আর কলবী এলেমের জন্য দ্বারস্থ হতে হবে সুফিয়ায়ে কেরামের। কামেলে মোকাম্মেল পীর-মোর্শেদগণের। কেননা কলবী এলেম তাঁরা ছাড়া অন্য কেউ জানেন না। তাঁদের তরিকায় চলা ফরজ— এরকম কথা বলা হয়েছে তাফসীরে মাযহারী'র ২য় খণ্ডের ১৩৫ পৃষ্ঠায়। পড়ুন— "যখন প্রমাণিত হলো, নফসের অপবিত্রতার হিসাব শারীরিক আমলের হিসাবের চেয়ে কঠিন এবং সাধ্যাতীত দায়িত্ব মানুষকে অর্পণ করা হবে না, তখন বান্দার তো উচিত হবে অন্তরের কামনা-বাসনার অনুসারী না হওয়া। অপবিত্রতা দূর করার জন্য যারা সুফীগণের (হক্কানী পীর-মোর্শেদগণের) সঙ্গে অটুট সম্পর্ক রাখার চেষ্টায় রত থাকে, আশা করা যায়, আল্লাহ্পাক তাদের সমস্ত গোনাহ্ মাফ করে দিবেন। হিসাব নিবেন না। কেননা তারা সাধ্যমতো চেষ্টা করেছে। পক্ষান্তরে যারা উদাসীনতার বশবর্তী হয়ে এরকম চেষ্টা-সাধনা থেকে বিরত থাকবে, তারা অবশ্যই দোজখে যাবে।

প্রমাণিত হলো যে, সুফিগণের তরিকায় চলা, ফকির দরবেশগণের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা ফরজ, যেমন ফরজ আল্লাহ্র কিতাব তেলাওয়াত এবং তার আহকাম শিক্ষা করা। রসুলে আকরম স. এরশাদ করেছেন, 'আমি তোমাদের জন্য দুটি জিনিস রেখে গেলাম— কিতাবুল্লাহ ও আহলে বাইত (বংশধর)।' অতঃপর আল্লাহ্র হুকুম মেনে চলা এবং তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য আল্লাহ্র কালামকে আশ্রয় করা অত্যাবশ্যক। সাথে সাথে আল্লাহ্তায়ালার সন্তোষ অর্জনার্থে বিশুদ্ধ অন্তর (সলীম কলব) এবং প্রশান্ত প্রবৃত্তি (নাফসুল মুতমাইন্না) লাভের জন্য রসুলেপাক স. এর বংশধরগণের (রূহানী ও জিসমানী) সঙ্গে সম্পর্ক রাখাও অত্যাবশ্যক।"

তাফসীরে মাযহারী'র দ্বিতীয় খণ্ডের ১২৯ পৃষ্ঠায় আরো উল্লেখ করা হয়েছে— সুফী বলে ওই সকল মানুষকে, হাদিস শরীফে যাদের নাম দেওয়া হয়েছে ফোকারা ও মু'মিনীন। রসুলেপাক স. এরশাদ করেছেন, আমিই প্রথমে জান্নাতের দরজার শিকল নাড়াবো। জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হবে আমার জন্যই। আমি জান্নাতে যখন প্রবেশ করবো, তখন আমার সাথে থাকবে ফকির ও মুমিনীন। আমার একথা গৌরবমুক্ত।

যার কিছুই নেই, তাকে বলে ফকির। সুফীদের কিছুই থাকে না। তাঁরা তাঁদের অস্তিত্বকে আল্লাহ্র ইচ্ছার অনুকূলে উৎসর্গ করে দেন। উদ্দেশ্য থাকে কেবল আল্লাহ্। প্রবৃত্তির পীড়া ও গোপন পাপ তাঁদেরকে ছেড়ে চলে যায়। তাঁরাই পূর্ণ মানুষ (কামেল ইনসান)। কামালিয়াত ও পূর্ণতাকে তাঁরা ভাবেন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত আমানত। তাঁরা তাঁদের প্রত্যেক পুণ্যকর্মের সম্পর্ক দেখেন আল্লাহ্র দিক থেকে। দেখতে পান, পুণ্যকর্ম সম্পাদন সম্পূর্ণতই আল্লাহ্পাক প্রদত্ত তওফিকনির্ভর। এজন্য পুণ্যলাভের পরেও তাঁরা আত্মগৌরবের শিকার হন না। উল্লেখিত হাদিসে রসুলেপাক স. তাঁর উম্মতের সত্তর হাজার মানুষের বিনা হিসাবে জান্নাত গমনের কথা বলার পর আরো বলেছেন, তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে থাকবে আরো সত্তর হাজার করে। তাঁরা কামেল এবং অন্যের কামেল হওয়ার পথপ্রদর্শক। তাঁরা আম্বিয়া, আউলিয়া, মোর্শেদ। তাঁদের প্রত্যেকের সাথে থাকবে আরো সত্তর হাজার করে— তাঁরা ওলামায়ে রসিখীন, আউলিয়া, সিদ্দিকীন এবং সলিহীন। প্রথম দল পথপ্রদর্শক ও মোর্শেদ। প্রথম দল কামেলদের এবং দ্বিতীয় দল যাঁদেরকে কামেল বানানো হয়েছে, তাঁদের। এরপর জান্নাতে প্রবেশ করবে তিনটি দল— একদল আল্লাহ্র পথে জীবনদানকারী শহীদগণের। দ্বিতীয় দল তাঁরা, যাঁরা আল্লাহ্র সন্তোষ অর্জনের নিমিত্তে সারা জীবন সত্যানুসরণের কাজে ব্যয় করেছেন। তাঁরা এমন মুরিদের দল— যাঁরা সম্পর্ক স্থাপন করেছেন কামেলীন ও

মোকাম্মেলীনদের সঙ্গে। তৃতীয় দল তাঁরা, যাঁরা আল্লাহ্‌র সন্তোষ অর্জনার্থে ব্যয় করেছেন তাঁদের সম্পদ। তারা হবে প্রথম ও দ্বিতীয় দলের অনুগামী। বলা বাহুল্য, এই মহান সুফী-পীর-মোর্শেদগণই আল্লাহ্‌র ওলী (বন্ধু)। তাঁদের সম্পর্কে কোরআন মজীদের সুরা ইউনুস এর ৬২-৬৪ সংখ্যক আয়াতে বলা হয়েছে—

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ - الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّقُوْنَ - لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ؕ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ -

(জানিয়া রাখ! আল্লাহ্‌র বন্ধুদের কোনো ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না। যাহারা বিশ্বাস করে এবং সাবধানতা অবলম্বন করে, তাহাদের জন্য আছে সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পারলৌকিক জীবনে, আল্লাহ্‌র বাণীর কোনো পরিবর্তন নাই; ইহাই মহাসাফল্য)।

আলোচ্য আয়াতের মূল বক্তব্য হচ্ছে— ওলীআল্লাহ্‌গণের (আল্লাহ্‌র বন্ধুগণের) কোনো ভয় নেই। কিয়ামতের দিন তাঁদের অন্তরে আযাব-গজবের কোনো ভয় তো থাকবেই না, থাকবে না অপ্রাপ্তিজনিত কোনো আক্ষেপ। তখন তাঁরা হবেন পূর্ণপরিতৃপ্ত।

'ওয়ালায়ি' এবং 'তাওয়ালি' শব্দ দুটোর আভিধানিক অর্থ- দুই বা ততোধিক বস্তুর সহজ সরল সম্পৃক্তি ও নৈকট্য। রূপক অর্থ এখানে গ্রহণীয়। অর্থাৎ এখানে নৈকট্য শব্দটিই বিবেচ্য। সে নৈকট্য স্থানগত, পরিবারগত, ধর্মীয় বিশ্বাস সম্বন্ধীয়, সৌহার্দিক, সাহায্য ও সম্মান সম্পর্কীয়— যাই হোক না কেনো। 'কামুস' অভিধান গ্রন্থে রয়েছে 'ওয়ালইউন ক্বরীব ওয়ালিউন'। 'ওয়ালইউন' হচ্ছে বিশেষণাত্মক শব্দ। এর অর্থ নৈকট্যপ্রদানকারী, বন্ধু, সাহায্যকারী।

বেলায়েত বিষয়ক আলোচনাঃ স্বাভাবিকভাবে সকল ব্যক্তি ও বস্তু আল্লাহ্‌পাকের নিকটবর্তী। কিন্তু এই নৈকট্যের তত্ত্ব ও ধরন কী তা কারো জানা নেই। আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন—

نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ -

(আমি তোমাদের প্রাণরগ অপেক্ষাও নিকটে)। সুরা ক্বফ, আয়াত ১৬। এই নৈকট্যের কারণে সৃষ্টি তার অনস্তিত্ব পরিত্যাগ করে অস্তিত্বে স্থিত হতে পেরেছে এবং প্রবহমান রাখতে পেরেছে জীবনকে। এই নৈকট্য ছাড়া সৃষ্টির অস্তিত্বপ্রাপ্তি ছিলো অসম্ভব। আল্লাহ্‌র পবিত্র অস্তিত্বের আনুরূপ্যবিহীন আলোয় পূর্ণরূপে অপসারিত হয়েছে অনস্তিত্বের দুর্জ্ঞেয় অধ্যায়। আল্লাহ্‌র সংগে সৃষ্টির এই নৈকট্যটি একটি সাধারণ নৈকট্য। কিন্তু তাঁর বিশেষ দাসদের সঙ্গে তাঁর একটি বিশেষ নৈকট্য রয়েছে। ওই নৈকট্য হচ্ছে মহব্বত বা প্রেম-ভালোবাসা। যারা আত্মিক দর্শনধারী (কাশফ্‌ধারী), তাঁরা উদাহরণের জগতে (আলমে মেছালে) এই নৈকট্যের একটি আনন্দদায়ক আকৃতি অবলম্বন করেন।

সৃষ্টির স্বাভাবিক নৈকট্য এবং বিশেষ ব্যক্তিগণের বিশেষ নৈকট্যের মধ্যে প্রকাশ্য সাদৃশ্য থাকলেও নৈকট্যের ধরন দুটো পৃথক। আর বিশেষ নৈকট্যের পথ অন্তহীন। হাদিসে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ্‌পাক বলেন, আমার বান্দারা নফলের কারণে আমার নৈকট্য অর্জনে সমর্থ হয়। এমতাবস্থায় আমি তাদেরকে ভলোবাসি। যখন ভালোবাসি, তখন আমি হয়ে যাই তার শ্রুতি, যার মাধ্যমে সে শোনে এবং হয়ে যাই তার দৃষ্টি, যার মাধ্যমে সে অবলোকন করে (তার ওই সময়ের সকল কাজ দৃশ্যত তার, মূলত আমার)। হজরত আবু হোরায়রা রা. থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বোখারী। ভালোবাসাজাত এই নৈকট্যের প্রথম স্তর হচ্ছে ইমান বা বিশ্বাস। আল্লাহ্‌পাক বলেছেন 'আল্লাহু ওয়ালি উল্‌লাজীনা আমানু' (আল্লাহ্‌ই বিশ্বাসীগণের অভিভাবক)। এই বিশেষ নৈকট্যের সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে নবী ও রসূলগণের সর্বোচ্চ স্তর। ওই স্তরের মূল নায়ক রসুল মোহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাঁর নৈকট্য ও ভালোবাসার সীমা-পরিসীমা নেই।

মহান সুফিগণের অভিমতানুসারে যাঁরা এই বিশেষ নৈকট্য অর্জন করেন, তাঁরাই আল্লাহ্‌র ওলী। আল্লাহ্‌র জিকিরে সতত সচল থাকে তাঁদের হৃদয়। প্রত্যুষে ও সায়াহ্নে তাঁরা আল্লাহ্‌পাকের পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকেন। প্রেম-সাগরে হাবুডুবু খান সারাক্ষণ। তাই আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের মহব্বত তাঁদের হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে না। পিতা-পুত্র-বন্ধু-বধু—কারো সঙ্গেই তাঁরা সত্তাগতভাবে সম্পৃক্ত নন। কাউকে ভালোবাসলে তাঁরা আল্লাহ্‌র জন্যই ভালোবাসেন। ঘৃণা করলেও ঘৃণা করেন আল্লাহ্‌রই জন্য। দান করলেও দান করেন আল্লাহ্‌রই জন্য। আল্লাহ্‌র জন্যই সৃষ্টির সঙ্গে কখনো হন সম্পৃক্ত, কখনো পৃথক।

সুফিগণের মধ্যে এই অবস্থার নাম ফানায়ে কলব (কলবের সমাহিতি)। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য উভয় অবস্থায় তাঁরা বিশুদ্ধচিত্ত (মুখলিস)। আল্লাহ্‌র অপছন্দনীয়

বিষয়াবলী থেকে মুক্ত। শির্কে জলি ও শির্কে খফি (স্থূল ও সূক্ষ্ম শিরিক) থেকে পবিত্র। পবিত্র শির্কে আখফা (সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শিরিক) থেকেও। যে শিরিক পিপিলীকার পদবিক্ষেপের চেয়েও মৃদু, সেই শিরিকের সঙ্গেও তাঁদের কোনো সংস্রব থাকে না। সম্পৃক্তি থাকে না অহংকার-অহমিকা, হিংসা-লোভ-পরশ্রীকাতরতা ইত্যাকার অপবিত্রতাগুলোর সঙ্গেও। তখন তাঁদের প্রবৃত্তিও (নফসও) হয় পরিশুদ্ধ। এই অবস্থাকে তাঁরা বলেন 'ফানায়ে নফস' (প্রবৃত্তির সমাহিতি)। তাঁরা একথাও বলেন, যাঁরা এই স্তরে উপনীত হন, তাঁরাই ওলীআল্লাহ্। শয়তান চিরদিনের জন্য পরাস্ত হয় তাঁদের কাছে।

পরের আয়াতে (৬৩) বলা হয়েছে 'যারা বিশ্বাস করে এবং সাবধানতা অবলম্বন করে' এখানে বিশ্বাস করে বলে বুঝানো হয়েছে ওলীআল্লাহ্গণকে। তাঁরাই পূর্ণ ইমানদার। হৃদয় বা কলব হচ্ছে ইমানের আধার। আল্লাহ্র জিকিরে হৃদয় সদা পরিতৃপ্ত রাখাই ইমানদারদের বৈশিষ্ট্য। তাঁদের কলব আল্লাহ্র জিকির থেকে এক মুহূর্তও গাফেল থাকে না। সৃষ্টির প্রতি তাঁদের অন্তরের অন্তস্থলজনিত মনোযোগ নেই।

এরপর বলা হয়েছে 'এবং সাবধানতা অবলম্বন করে'। 'তাকওয়া' অর্থ সাবধানতা, আল্লাহ্ভীতিজনিত সতর্কতা, আল্লাহ্নির্ভরতা। অর্থাৎ ওই সকল ওলী প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে আল্লাহ্র পরিপূর্ণ আনুগত্যকে আশ্রয় করে থাকেন। হজরত ওমর ফারূক রা. বলেছেন, কোনো কিছু থেকে তুমি নিজেকে উত্তম মনে কোরো না— এটাই তাকওয়া। জনৈক বুজুর্গ বলেছেন, যে নিজেকে ফিরিঙ্গি কাফেরের চেয়ে উত্তম ভাবে, তার উপর আল্লাহ্র মারেফাত হারাম।

হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব রা. থেকে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্পাকের বান্দাগণের মধ্যে এমন লোকও আছেন, যাঁরা নবী অথবা শহীদ কোনোটাই নন, কিন্তু কিয়ামতের দিন ওই সকল লোককে নবী-রসুল ও শহীদগণের সমমর্যাদাসম্পন্ন হতে দেখে সকলে তাঁদেরকে সম্মান প্রদর্শন করবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল ! তাঁরা কারা? তিনি স. জবাব দিলেন, যারা কেবল আল্লাহ্র জন্য আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশী ও অন্য সকলকে ভালোবাসে (ধন সম্পদ বা অন্য কোনো কারণে নয়)। আল্লাহ্র শপথ! কিয়ামতের দিন তাদের নূরই হবে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রোজ্জ্বল। আল্লাহ্র শাস্তির ভয়ে মানুষ তখন থাকবে ভীত-সন্ত্রস্ত। কিন্তু তাদের থাকবে না কোনো ভয়-ডর। মানুষ দুঃশ্চিন্তায় ডুবে যাবে, কিন্তু তারা থাকবে দুঃশ্চিন্তামুক্ত। এরপর তিনি স. পাঠ করলেন 'আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহি লা খওফুন আ'লাইহিম ওয়ালাহুম ইয়াহ্জানুন' (জেনে রাখো!

আল্লাহ্‌র বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না)। হজরত আবু মালেক থেকে বাগবীও এই হাদিসটি লিখেছেন। বায়হাকী লিখেছেন তাঁর 'শো'বুল ইমানে'।

হজরত আবু হোরায়রা রা. কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. একবার 'আলা ইন্‌না আউলিয়া আল্লাহ্‌' এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেছিলেন, তারা ওই সকল লোক, যারা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে একে অপরকে ভালোবাসে। হজরত জাবের রা. থেকে ইবনে মারদুবিয়াও এরকম বর্ণনা করেছেন।

বেলায়েত অর্জনের মাধ্যমঃ বেলায়েত বা নৈকট্য অর্জনের প্রধানতম মাধ্যম হচ্ছেন রসুলে মকবুল হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহ্‌মদ মুজতবা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সাহাবায়ে কেরাম তাঁর মাধ্যমে বেলায়েত অর্জন করেছিলেন। পরবর্তী যুগে বেলায়েত অর্জনের মাধ্যম হয়েছেন রসুলে পাক স. এর প্রতিনিধিবৃন্দ, অর্থাৎ আউলিয়ায়ে কেরাম। সুতরাং আউলিয়ায়ে কেরামের আনুগত্য ও অনুসরণ জরুরী। তাঁদের পুর্ণ অনুসারী হলে অন্তর ও বাহির আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত হয়। একেই বলে 'সিবগাতুল্লহ্‌' (আল্লাহ্‌র রঙ)। এ সম্পর্কে সুরা বাকারায় ১৩৮ আয়াতে বলা হয়েছে 'সিবগাতুল্লহ্‌ ওয়ামান আহসানু মিনাল্লহি সিবগাহ্‌ (আমরা গ্রহণ করলাম আল্লাহ্‌র রঙ। রঙে আল্লাহ্‌ অপেক্ষা কে অধিকতর সুন্দর)।

আউলিয়া কেরাম কর্তৃক প্রবর্তিত তরিকাসমূহের মাধ্যমে বিরতিহীন জিকির অর্জন করা যায়। অপসারিত করা যায় অন্তরের অপরিচ্ছন্নতা সমূহকে। হৃদয় হয়ে যায় দর্পনের মতো স্বচ্ছ ও পবিত্র। রসুলেপাক স. বলেছেন, প্রতিটি বস্তু পরিষ্কার করার জন্য রয়েছে শানযন্ত্র। আর অন্তর পরিষ্কার করার জন্য রয়েছে আল্লাহ্‌র জিকির। বায়যাবী।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা. থেকে ইমাম মালেক, আহ্‌মদ ও বায়হাকী লিখেছেন, হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুলেপাক স. কে একথা বলতে শুনেছি– আল্লাহ্‌পাক বলেন, দু'জন ব্যক্তি যদি আমার জন্য একজন আর একজনকে ভালোবাসে, এক সঙ্গে ওঠাবসা করে এবং একে অপরের জন্য ব্যয় করে, তবে তাদেরকে ভালোবাসা আমার উপরে হয়ে যায় ওয়াজিব। হজরত উবাদা ইবনে সামেত থেকে ইমাম আহ্‌মদ, তিবরানী ও হাকেম এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

হজরত ইবনে মাসউদ রা. থেকে বোখারী ও মুসলিম লিখেছেন, এক লোক রসুল স. সকাশে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহ্‌র বচনবাহক! ওই লোক সম্পর্কে বলুন, যে দূরে থেকে কোনো এক সম্প্রদায়কে আল্লাহ্‌র জন্য ভালোবাসে,

কিন্তু তাদের নিকটে পৌঁছতে পারে না। রসুলেপাক স. বললেন, ওই লোকের হাশর হবে তার ওই প্রিয়জনদের সঙ্গে। এখানে উল্লেখিত প্রশ্নটির উদ্দেশ্য ছিলো একথা বলা যে, আমলের দিক থেকে ওই লোক তার ওই প্রিয়জনদের নিকটবর্তী নয়। হজরত আনাস থেকে বোখারী ও মুসলিমও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বায়হাকী তাঁর 'শো'বুল ইমানে' লিখেছেন, হজরত আবু রযীন উল্লেখ করেছেন, রসুলেপাক স. আমাকে বলেছেন, নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করো— কোন পথে রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ? মনে রেখো, প্রকৃত কল্যাণ হচ্ছে জিকিরকারীদের সভায় উপস্থিত হয়ে তাদের সাথে জিকির করা। যখন একাকী থাকবে, তখনও জিকির জারী রেখো। আর মানুষকে ভালোবাসো আল্লাহ্র ওয়াস্তে, ঘৃণাও করো আল্লাহ্র ওয়াস্তে।

হজরত আবু জর গিফারী থেকে আহ্মদ ও আবু দাউদ লিখেছেন, রসুলে আকরম স. বলেছেন, আল্লাহ্পাকের নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় আমল হচ্ছে, কেবল আল্লাহ্র সন্তোষার্থে ভালোবাসা ও শত্রুতা ।

আল্লাহ্পাকের মহব্বতঃ আউলিয়া কেরামের সকলেই আল্লাহ্র মোহেব (প্রেমিক)। তাঁদের মধ্যে আবার কেউ কেউ আল্লাহ্র মাহবুব (প্রেমাস্পদ)। হজরত আবু হোরায়রা রা. থেকে ইমাম মুসলিম লিখেছেন, রসুলে করীম স. বলেছেন, আল্লাহ্ যখন তাঁর কোনো বান্দাকে মহব্বত করেন, তখন জিব্রাইলকে ডেকে বলেন, আমি আমার অমুক বান্দাকে মহব্বত করি, তুমিও তাকে মহব্বত করো। তখন জিব্রাইল তাকে ভালোবাসতে থাকে এবং আসমানের অন্যান্য ফেরেশতাদেরকে ডেকে বলে, আল্লাহ্ তাঁর অমুক বান্দাকে মহব্বত করেন, তোমরাও তাকে মহব্বত করো। তখন আসমানের সকল ফেরেশতা তাকে ভালোবাসে। সে তখন পৃথিবীবাসীদের কাছেও ভালোবাসার পাত্র হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ যখন তাঁর কোনো বান্দাকে অপছন্দ করেন, তখন জিব্রাইলকে ডেকে বলেন, আমি ওই লোককে অপছন্দ করি, তুমিও তাকে অপছন্দ করতে থাকো। জিব্রাইল তাকে অপছন্দ করতে থাকে এবং আকাশের ফেরেশতাদেরকে ডেকে বলে, অমুক ব্যক্তি আল্লাহ্র অপ্রিয়, তোমরাও তাকে ঘৃণা করতে থাকো। এ কথা শুনে ওই ফেরেশতারাও ওই লোককে ঘৃণা করতে থাকে। শেষে পৃথিবীবাসীদের নিকটেও সে হয় ঘৃণার পাত্র।

ওলী আল্লাহ্গণের বৈশিষ্ট্যঃ রসুলে আকরম স. কে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র রসুল! আউলিয়া কারা? তিনি স. বললেন, যাদেরকে দেখলে আল্লাহ্র কথা মনে হয়। তিনি স. আরো বলেছেন, আল্লাহ্পাক এরশাদ করেন,

আমার বান্দাগণের মধ্যে তারাই আউলিয়া, যাদের কথা স্মরণ হলে আমার কথা স্মরণ হয় এবং আমার কথা স্মরণ করা হলেও তাদের কথা স্মরণ হয়। হাদিস দু'টি বর্ণনা করেছেন ইমাম বাগবী।

হজরত আসমা ইবনে ইয়াজিদ বলেন, আমি রসুলেপাক স. কে এরকম বলতে শুনেছি— আমি কি বলবো, তোমাদের মধ্যে উত্তম কে? সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! অবশ্যই বলুন। তিনি স. বললেন, যাদেরকে দেখলে আল্লাহ্র কথা স্মরণ হয়।

দ্রষ্টব্যঃ উপরে বর্ণিত হাদিসগুলোর মধ্যে রয়েছে সূক্ষ্ম রহস্য। সেই সূক্ষ্ম রহস্যটি এই— আল্লাহ্ ও আউলিয়া একে অপরের সঙ্গে প্রেম-ভালোবাসা সূত্রে সম্পর্কিত। তাই একজনকে স্মরণ করলে আর একজনের কথা মনে হতে থাকে আপনাআপনিই। যেমন সূর্যরশ্মির সম্মুখে স্থাপিত আয়না। ওই আয়নায় পড়ে সূর্যকিরণের প্রতিফলন। ফলে আয়নার সম্মুখে স্থাপিত বস্তুও সূর্যকিরণের প্রতিবিম্বের প্রতিফলনে সমুজ্জ্বল হয়। ওই আয়নার কাছে তুলা রাখলে সে তুলাতে ধরে যায় আগুন। অথচ সরাসরি সূর্যকিরণে আগুন ধরে না। উল্লেখ্য, আল্লাহ্পাক তাঁর ওলীগণকে দান করেছেন শুদ্ধিকরণের যোগ্যতা এবং সঠিক পরিমাপবোধ। আল্লাহ্র নূরে নূরান্বিত হওয়ার কারণে তাঁরা মানুষকে পরিশুদ্ধ করতে পারেন। তাই তাঁদের সংসর্গ (সোহবত) আল্লাহ্পাকের সংসর্গ তুল্য এবং তাঁদের স্মরণ আল্লাহ্পাকের স্মরণের অনুরূপ। তাঁদের দর্শন যাঁরা পান, তাঁদের সঙ্গে উপবেশন করেন, তাঁরা কখনো বঞ্চিত হন না। পথভ্রষ্ট হন না। আর তাঁদেরকে যারা প্রত্যাখ্যান (এনকার) করে, তারা কখনো হেদায়েতের ফয়েজ লাভ করতে পারে না। তারা ফাসেক। আর ফাসেক সম্পর্কে আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন—

وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِ -

(আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না) । সুরা মায়িদা, আয়াত ১০৮।

রসুলে আকরম স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্পাক হাদিসে কুদসীতে ঘোষণা করেছেন, 'মান আ'দা লী ওয়ালিয়ান ফাক্বাদ আজানতাহু বিল হারবি' (যে আমার ওলীর সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি)। হজরত আবু হোরায়রা রা. থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বোখারী।

পর্যালোচনাঃ তিন

আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালা তাঁর কালামে মজীদে এরশাদ করেন—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ -

(হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও)। সুরা তওবা, আয়াত ১১৯।

ব্যাখ্যাঃ মুফাস্সিরগণ লিখেছেন, সত্যবাদী বলে এখানে সুফি-মাশায়েখগণকে বুঝানো হয়েছে। যখন কোনো ব্যক্তি তাঁদের খাদেম হয়ে যায় তখন তাঁদের তরবিয়ত ও বুজুর্গীর বদৌলতে সে উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছে যায়। শায়েখে আকবর র. লিখেছেন, যদি তোমার কাজকর্ম অপরের অধীনে না হয়, তবে তুমি সারাজীবন সাধনা করেও প্রবৃত্তির (নফসের) কামনা বাসনা থেকে মুক্তি পাবে না। অতএব, যখনই তুমি এমন ব্যক্তির সন্ধান পাও, যার প্রতি তোমার অন্তরে ভক্তি-শ্রদ্ধা হয়, তখনই তাঁর খেদমতে লিপ্ত হও। তাঁর সামনে তুমি মুর্দার মতো হয়ে থাকো, যাতে তিনি তোমার ব্যাপারে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তোমার ইচ্ছা বলতে কোনো কিছু যেনো না থাকে। তাঁর হুকুম পালনে বিলম্ব কোরো না। তিনি যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো। যদি কোনো পেশা গ্রহণ করতে বলেন, তবে গ্রহণ করো। কিন্তু তা গ্রহণ করো তাঁর নির্দেশের কারণে, নিজের পছন্দের কারণে নয়। তিনি বসে থাকতে বললে বসেই থাকো। অতএব, এটা অত্যন্ত জরুরী যে, কামেল শায়েখ তালাশ করতে সচেষ্ট হও। তাহলে তিনি তোমাকে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে পৌঁছিয়ে দিবেন।

ব্যাখ্যাটি উদ্ধৃত করা হলো 'ফাযায়েলে তবলীগ' থেকে। এখানকার কামেল শায়েখ কথাটির অর্থ কামেল পীর-মোর্শেদ। কলবী এলেম থাকে তাঁদের কলবে। আমাদের উচিত, বায়াতের বন্ধনে তাদের সঙ্গে আবদ্ধ হওয়া— মুরিদ হওয়া। তারপর আদব, খেদমত ও মহব্বতের সঙ্গে তাঁদের নির্দেশানুসারে জীবন যাপন করা।

পুস্তক পড়ে, মাদ্রাসায় যাতায়াত করে, ওয়াজ-নসিহত করে ও শুনে শিক্ষা করা যায় জবানী এলেম। কলবী এলেম কখনোই নয়। কাগজে 'আগুন' শব্দটি লিখলে যেমন তাতে আগুন ধরে না, তেমনি একা একা বা সম্মিলিতভাবে 'আগুন' আগুন' বলে চিৎকার করলেও পাওয়া যায় না আগুন। বুঝতে হবে আল্লাহ্প্রেমের আগুন থাকে সুফি-পীর-মাশায়েখগণের কলবে। এই জ্ঞানের নূরের আদান প্রদান চলতে থাকে কলব থেকে কলবে।

'তাফসীরে মাযহারী' গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ২৮৯ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে— জ্ঞান দু' ধরনের— ১. এলমে হুসুলী (জবানী এলেম) এবং ২. এলমে হুজুরী (কলবী এলেম)। বাংলায় বলা যেতে পারে— অর্জিত জ্ঞান এবং আত্মজ্ঞান। অর্জিত জ্ঞান ইন্দ্রিয় নির্ভর এবং আত্মজ্ঞান ইন্দ্রিয়াতীত। নবী-রসুলগণ এই আত্মজ্ঞানে জ্ঞানী। তাই তাঁদের অন্তর্দপণে মারেফাতের সূর্যালোক প্রতিবিম্বিত হয়। প্রকৃত বিশ্বাসীরা তাঁদের নিজেদের অন্তরের আয়নায় সেই প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্ব ধারণ করে আত্মজ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে যান। ওই আয়নার প্রকৃত তত্ত্ব উদঘাটন দুরূহ। এই জ্ঞান সত্তাসন্নিহিত, সত্তাস্থিত। সত্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে কোনো দলিল প্রমাণের প্রয়োজন হয় না, আমি-ই যে আমি– এ কথা বিনা চেষ্টায় বিনা চিন্তা-ভাবনায় বুঝা যায়; আত্মজ্ঞানীরাও তেমনি সহজেই বুঝে থাকেন আল্লাহ্ই আল্লাহ্। তাঁদের ইমান তাই স্বতঃস্ফূর্ত ও পবিত্র। সন্দেহ- প্রমাণের মলিনতার প্রবেশাধিকারের সুযোগ সেখানে নেই। কোরআন মজীদের প্রকাশ্য বর্ণনা, দলিল প্রমাণ অর্জিত জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, আর আত্মজ্ঞান যেহেতু সত্তাসম্পৃক্ত, তাই এই জ্ঞান মানুষ তার অস্তিত্বের আধারেই বহন করে চলেছে। সত্তা থেকে সত্তায় (কলব থেকে কলবে) বয়ে চলেছে এই জ্ঞানের প্রবাহ। সেই জ্যোতির্ময় প্রবাহের শিক্ষক ও পরিচালক হচ্ছেন মহান সুফি সম্প্রদায়।

তাঁদের কাছে বায়াত হয়ে আমাদেরকে হুজুরী কলব লাভ করতে হবে। কারণ হুজুরী কলব না হলে পাপমুক্ত হওয়া যায় না। তাফসীরে মাযহারীর তৃতীয় খণ্ডের ৬২ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে 'একাগ্রচিত্ততা (হুজুরী কলব) অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত পাপমুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। নামাজের পবিত্রতা ও পূর্ণতাও হুজুরী কলবের উপর নির্ভরশীল। আর তরিকার প্রকৃত মোর্শেদের মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালার পথে অগ্রসর হওয়ার সাধনায় লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত হুজুরী কলব হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই তোমরা কামেলে মোকাম্মেল পীর-মোর্শেদের তরিকাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো। তাঁদের সান্নিধ্যে যাও। এরকম করলে তোমরা কখনো হতভাগ্য হবে না। তাঁদের বন্ধুরা কখনো অকৃতকার্য হন না।

আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন করতে গেলে নিজেকে চেষ্টা সাধনা আমল তো করতেই হবে, তদুপরি লাগবে পীর মোর্শেদের তাওয়াজ্জোহ্। তাফসীরে মাযহারীর দ্বাদশ খণ্ডের ৯৯ পৃষ্ঠায় বিষয়টির বিবরণ দেওয়া হয়েছে এভাবে— একারণেই সুফী সাধকগণ বলেন, আধ্যাত্মিক পথের পথিকগণের আত্মিক বিনাশন (ফানা) অর্জিত হয় আল্লাহ্পাকের প্রেমাকর্ষণে (জজ্বায়), নবী-রসুলগণ বা পীর-মোর্শেদের মাধ্যমে। সুতরাং কেউ যদি পীর-মোর্শেদ ব্যতিরেকে স্বচেষ্টায় কেবল ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে ওই স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে চায়, তবে তার সময় লাগবে পঞ্চাশ

হাজার বৎসর। কিন্তু পঞ্চাশ হাজার বৎসর আয়ুবিশিষ্ট কেউই নয়। তাছাড়া পৃথিবী যে আরো পঞ্চাশ হাজার বৎসর টিকে থাকবে তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং আসতে হবে সহজ সরল পথে। বুঝতে হবে, আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে জজ্বা ও পীর মোর্শেদের তাওয়াজ্জোহ্ ছাড়া ফানা লাভ করা অসম্ভব।

এভাবে নিজেকে পবিত্র করতে হবে। আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালা এরশাদ করেছেন— 'ক্বদ্ আফলাহা মান যাক্কাহা' (সেই সফলকাম হয়েছে, যে নিজেকে পবিত্র করেছে'। সুরা শামস্, আয়াত ৯।

হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, আমি স্বয়ং রসুল স. কে এই আয়াতের ব্যাখ্যা ব্যাপদেশে বলতে শুনেছি, ওই নফস সফল, যাকে আল্লাহ্ পবিত্র করে দিয়েছেন। জুয়াইবিরের পদ্ধতিতে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে জারীর। সুপরিণত সূত্রে হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম থেকে মুসলিম, তিরমিজি, নাসাঈ এবং ইবনে আবী শায়বা বর্ণনা করেছেন, রসুলে আকরম স. বলতেন, 'ইয়া ইলাহী! আমি তোমার সকাশে আশ্রয় যাচ্ঞা করি অস্বস্তি, আলস্য, অপৌরুষ, অতিবার্ধক্য এবং কবরের শাস্তি থেকে। হে আমার প্রভুপালক! আমার হৃদয়কে সংযম ও পবিত্রতা দিয়ে পরিপূর্ণ করে দাও। তুমিই প্রবৃত্তি পবিত্রতাকারী হিসেবে সর্বশ্রেষ্ঠ। তুমিই প্রবৃত্তির সকল কর্মের অধিকর্তা ও অভিভাবক। হে আমার পরম প্রভুপালনকর্তা! আমি পরিত্রাণ প্রার্থনা করি ওই জ্ঞান থেকে, যা শুভপ্রসূ নয়। ওই হৃদয় থেকে, যা বিনয়াবনত নয় এবং ওই প্রার্থনা থেকে, যা গ্রহণযোগ্য নয়'।

বর্ণিত ব্যাখ্যার আলোকে আয়াতখানির মর্মার্থ দাঁড়ায়— আল্লাহ্পাক তাঁর গুণবত্তার (সিফাতের) জ্যোতিসম্পাত (তাজাল্লি) দ্বারা যে নফসকে পবিত্র করেছেন, সেই নফস হয় আল্লাহ্ ও তাঁর বিধানে পরিতুষ্ট এবং তাঁর স্মরণ ও আনুগত্যে প্রশান্ত। সেই নফস বিরত থাকে আল্লাহ্ ও তাঁর পথের সকল প্রতিবন্ধকতা ও নিষেধাজ্ঞা থেকে। এরকম প্রবৃত্তির অধিকারী যাঁরা, তাঁরাই সফল। হাসান বসরী র. বলেছেন, যে ব্যক্তি তার প্রবৃত্তিকে (নফসকে) পরিশুদ্ধ করেছে, করেছে পুণ্য ও আনুগত্যমণ্ডিত, সে-ই সফলতার অধিকারী।

জেগে যারা ঘুমায়, তাদেরকে জাগানো যায় না। এ ধরনের অবস্থা হয়েছে এখনকার কিছুসংখ্যক আলেমদের। তারা সব কিছু জেনে শুনে বুঝেও পবিত্রতা অর্জনের পথে (তরিকতের পথে) আসতে চায় না। অন্যকেও আসতে বাধা দেয়। নিঃসন্দেহে তারা ওলামায়ে ছু' (দুনিয়াদার আলেম)। আমল করার স্থান তো এই পৃথিবীই। এখানেই গোমরাহির অন্ধত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে, নয়তো আখেরাতে আমরা অন্ধ হয়ে উঠবো। যেমন আল্লাহ্পাক এরশাদ ফরমান—

وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَ اَضَلُّ سَبِيْلًا -

(যে ইহজগতে অন্ধ, সে পরজগতেও অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট')। সুরা বানী ইসরাইল, আয়াত ৭২। একথার অর্থ— যে পৃথিবীতে সত্য পথ দেখতে পায় না, সে আখেরাতে পরিত্রাণের পথ তো পাবেই না। অর্থাৎ এই জগতে হেদায়েত না পেলে পরজগতে হেদায়েত প্রাপ্তি অসম্ভব। তখন তওবা করা ও তা কবুল হওয়ারও কোনো সুযোগ নেই। অতএব তওবা করলে করতে হবে এখানেই, এখনই।

পর্যালোচনাঃ চার

আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালা এরশাদ করেন—

وَ مَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَّ قَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ -

(কথায় কে উত্তম, ওই ব্যক্তি অপেক্ষা, যে আল্লাহ্র প্রতি মানুষকে আহবান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে ' আমি তো অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত)। সুরা হা-মীম আস্-সাজদা, আয়াত ৩৩। একথার অর্থ ওই ব্যক্তির চেয়ে কেউই উত্তম নয়, যে মানুষকে আল্লাহ্র দিকে ডাকে, নিজে পুণ্যকর্মে ব্যাপৃত থাকে এবং বলে, আমি তো মুসলমানদের মধ্যে একজন।

এখানে 'ক্বওলান' অর্থ গর্ব করা, অথবা ইসলামকে ন্যায়নীতির ধর্ম বানানো। অর্থাৎ এর প্রকৃত অর্থ হবে ধর্ম ও বিশ্বাস। মোহাম্মদ ইবনে সিরীন এবং সুদ্দী বলেছেন, এখানে 'যে আল্লাহ্র দিকে ডাকে' বলে বুঝানো হয়েছে রসুলেপাক স.কে। হাসান বসরী বলেছেন, এখানে বলা হয়েছে ওই সকল মুসলমানের কথা, যারা আল্লাহ্র রসুলের আহবানে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং নিজেকে মুসলমান বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছে। উম্মতজননী হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেছেন, আমি মনে করি এই আয়াতে প্রশংসা করা হয়েছে মুয়াজ্জিনদের।

এ পর্যন্ত ব্যাখ্যা করা হলো তাফসীরে মাযহারী থেকে। এবার দেওয়া হচ্ছে 'ফাযায়েল তবলীগ' পুস্তকের ভাষ্য। সেখানে বলা হয়েছে— মুফাস্সিরগণ

লিখেছেন, যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো পন্থায় মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে ডাকবে, সে-ই হবে এই আয়াতে উল্লেখিত সুসংবাদ ও প্রশংসার উপযুক্ত। যেমন নবী-রসুলগণ মোজেযা দ্বারা, আলেমগণ দলিল প্রমাণ দ্বারা, মুজাহিদগণ তরবারী দ্বারা এবং মুয়াজ্জিনগণ আজানের দ্বারা মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে আহবান জানান। মোট কথা যে ব্যক্তি কল্যাণের দিকে ডাকবে, সে-ই হবে শুভসংবাদের যোগ্য। চাই জাহেরী আমল ঠিক করার দিকে ডাকুক, অথবা ডাকুক বাতেনী আমল ঠিক করার দিকে, যেমন সুফিগণ ডাক দেন আল্লাহ্‌র মারেফাতের দিকে।

আলোচনার এ পর্যায়ে এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি সুফিগণও ধর্মপ্রচার (তাবলীগ) করেন। আর তাঁদের তাবলীগই মূল তাবলীগ। কারণ তাঁরা ডাকেন অভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধতা (এসলাহে বাতেন) অর্জনের জন্য। আর ইতোপূর্বের আলোচনায় আমরা জানতে পেরেছি অভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধিই বাহ্যিক পরিশুদ্ধতার ভিত্তি। অর্থাৎ কলব ঠিক হলে সবকিছু ঠিক হবে। আর কলব ঠিক না হলে কোনোকিছুই ঠিক হবে না। এভাবে আমাদের ভিতর ও বাহির ঠিক করে আমাদের বক্ষকে করতে হবে ইসলামের জন্য পরিপূর্ণরূপে উন্মুক্ত। যেমন আল্লাহ্‌পাক তাঁর কালামে পাকে উল্লেখ করেছেন—

فَمَنۡ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنۡ يَّهۡدِيَهٗ يَشۡرَحۡ صَدۡرَهٗ لِلۡاِسۡلَامِ‌ۚ وَمَنۡ يُّرِدۡ اَنۡ يُّضِلَّهٗ يَجۡعَلۡ صَدۡرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَآءِ‌ؕ كَذٰلِكَ يَجۡعَلُ اللّٰهُ الرِّجۡسَ عَلَى الَّذِيۡنَ لَا يُؤۡمِنُوۡنَ -

(আল্লাহ্ কাহাকেও সৎপথে পরিচালিত করিতে চাহিলে তিনি তাহার বক্ষ ইসলামের জন্য প্রশস্ত করিয়া দেন এবং কাহাকেও বিপথগামী করিতে চাহিলে তিনি তাহার বক্ষ অতিশয় সংকীর্ণ করিয়া দেন; তাহার কাছে ইসলাম অনুসরণ আকাশে আরোহণের মতোই দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। যাহারা বিশ্বাস করে না, আল্লাহ্ তাহাদিগকে এইরূপে লাঞ্ছিত করেন)। সুরা আনআ'ম, আয়াত ১২৫।

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হৃদয় প্রশস্ত হওয়া কী, তা জানতে চাওয়া হলো। রসুলেপাক স. বললেন, আল্লাহ্‌পাক ইমানদারগণের অন্তরে একপ্রকার নূর নিক্ষেপ করেন— ফলে তার অন্তর্জগত হয়ে যায় সুপ্রশস্ত, সুবিস্তৃত (ওই অবস্থাকেই বলা হয় শরহে সদর)।

একবার সাহাবীগণ রসুলেপাক স. কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! শরহে সদরের নিদর্শন কী? তিনি স. বললেন, চিরস্থায়ী আবাসের প্রতি আকর্ষণ,

পৃথিবীবিমুখতা, মৃত্যুর জন্য সদাপ্রস্তুতি এগুলোই হচ্ছে শরহে সদরের আলামত। হজরত ইবনে আব্বাস রা. কর্তৃক বর্ণিত এই হাদিসটি হাকেম তাঁর 'মুসতাদরাক' গ্রন্থে এবং বায়হাকী তাঁর 'শো'বুল ইমান' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। মুরসালরূপে ফারইয়ানী বর্ণনা করেছেন আবু জাফর থেকে। ইবনে জারীর ও আবদ ইবনে হুমাইদও হাদিসটির বর্ণনাকারী।

সুফি সম্প্রদায়ের মতে প্রবৃত্তির বিনাশ (নফসের ফানা) সাধিত হলে শরহে সদর হয়। তখন অপপ্রবৃত্তির (নফসের) কোনো চিহ্নই আর পরিলক্ষিত হয় না। আধ্যাত্মিক পথের পথিকগণ যখন বেলায়েতে কোবরায় (নবীগণের নৈকট্যের বৃত্তে) উপনীত হন, তখনই অর্জিত হয় প্রকৃত ইমান।

আরও উল্লেখ করেছেন—

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ -

(আল্লাহ্ ইসলামের জন্য যাহার বক্ষ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন এবং যে তাহার প্রভুপালক প্রদত্ত আলোতে রহিয়াছে, সেকি তাহার সমান যে এরূপ নহে? দুর্ভোগ সেই কঠোর হৃদয় ব্যক্তিদের জন্য যাহারা আল্লাহ্‌র স্মরণে পরাঙ্মুখ! উহারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে)। সুরা যুমার, আয়াত ২২।

আয়াতখানির মর্মার্থ হচ্ছে— আল্লাহ্ ইসলাম গ্রহণের জন্য যার বক্ষকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং ইসলাম গ্রহণের ফলে যে তার প্রভুপালক কর্তৃক প্রদত্ত জ্যোতি দ্বারা সমাবৃত রয়েছে, সে কি ওই লোকের সমতুল্য, যার বক্ষপ্রকোষ্ঠ রুদ্ধ? যাদের অন্তর আল্লাহ্‌র স্মরণমগ্ন নয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন দুর্ভোগ। তারা স্পষ্টতই পথভ্রষ্ট।

'শারাহাল্লহু সদরহু' অর্থ আল্লাহ্ যার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। 'নূরিম মির রব্বি' অর্থ প্রভুপালক প্রদত্ত নূর, জ্যোতি বা আলো। উল্লেখ্য, এই আলোই সত্য ও মিথ্যার স্বরূপ প্রদর্শক। এই আলো যে পায়, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের প্রতি তার বিশ্বাস হয়ে যায় চিরঅক্ষয়। আর এতে করে একথাও প্রতীয়মান হয় যে, ইমান বা বিশ্বাসকে ধারণ করে কলব বা অন্তর। মস্তিষ্ক বা অন্য কোনো অঙ্গ ইমানের আধার নয়। আল্লাহ্ প্রদত্ত এই আলোর অধিকারী মানুষকেই বলা যেতে পারে আলোকিত মানুষ। তাদেরই হৃদয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করে ইসলামের নির্দেশাবলী। হয়ে যায় অপরিমেয়রূপে প্রশস্ত। আর এখানকার 'নূর' শব্দটির অর্থ দিব্যদৃষ্টি বা অর্ন্তদৃষ্টি।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি শায়েখ আহ্‌মদ ফারুকী সেরহিন্দি র. এর এই উক্তিখানি আমাদেরকে ভালোভাবে বুঝতে হবে— শরীয়ত তিন ভাগে

বিভক্ত— এলেম (হালাল, হারাম, ফরজ, ওয়াজিব ইত্যাদি জেনে নেওয়া), আমল (উক্ত এলেম অনুযায়ী কার্য করা) এবং ইখলাস (বিশুদ্ধ নিয়ত)। এই তিনটিই শরীয়তের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এগুলো পূর্ণরূপে সুসম্পন্ন না হলে শরীয়তই হবে না। পূর্ণ শরীয়তের পাবন্দ হলে লাভ হবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। যেমন আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেন—

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ -

(আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিই বৃহত্তম)। সুরা তওবা, আয়াত ৭২। (মকতুব নং ৩৬, প্রথম খণ্ড)।

ইতোপূর্বেও একথা বলা হয়েছে যে, ইখলাস হচ্ছে এলেম, আমলের ও শরীয়তের রূহ। এই ইখলাস থাকে কলবে, যেমন হাদিসে কুদসীতে বলা হয়েছে— আল্লাহ্ বলেন, ইখলাস হলো আমার গোপন রহস্যসমূহের একটি গোপন রহস্য। আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে আমি মহব্বত করি, তার কলবেই আমি ইখলাসকে আমানত রাখি। মিরকাত।

আমাদেরকে অনুসন্ধান করে আল্লাহ্‌পাকের ওই সকল বান্দাদের কাছে পৌঁছতে হবে, যাঁদের অন্তরে আল্লাহ্‌পাক ইখলাসকে আমানত রেখেছেন। তাঁদের কলব তো আল্লাহ্‌পাকের তাজাল্লি প্রকাশেরও পাত্র। যেমন— হজরত আবু উত্‌বা খাওলানী রা. বর্ণনা করেছেন, নবী পাক স. বলেছেন, নিশ্চয় পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র তাজাল্লী প্রকাশের কিছু পাত্র আছে, নেককার ও সালেহ্ বান্দাদের কলবসমূহ হচ্ছে ওই পাত্র। তিবরানী। হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ র. বলেছেন, ফকিরগণের দিল আল্লাহ্‌প্রাপ্তির দরওয়াজা।

পর্যালোচনাঃ পাঁচ

উপসংহারে এসে আমরা নিশ্চয়ই একমত হতে বাধ্য হবো যে, পরিপূর্ণ শরীয়তের পাবন্দী হতে হলে পীর-মাশায়েখগণের মধ্যে প্রচলিত কোনো এক তরিকা গ্রহণ করতে হবে। কামেলে মোকাম্মেল পীর-মোর্শেদের কাছে মুরিদ ও বায়াত হতে হবে। তাঁদের সকলের তরিকাই সঠিক। কারণ তাঁদের এবং তাঁদের সকল তরিকার উদ্দেশ্য এক— অভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধি। তবে এক্ষেত্রে আমরা শুধু একটি কথাই বলতে চাই, সহজ ও যুগোপযোগী তরিকা গ্রহণ করাই সকলের জন্য সমীচীন। কাদেরিয়া, চিশ্‌তিয়া, নকশ্‌বন্দিয়া ও মোজাদ্দেদিয়া এই চারটি তরিকারই নাম এখন পর্যন্ত শোনা যায়। আমরা এই চার তরিকাকেই মান্য করি। বায়াত হই এই চার তরিকাতেই। কিন্তু আমাদের পীরানে কেরামের নির্দেশানুসারে

চর্চা করি খাস মোজাদ্দেদিয়া তরিকার। কেননা আল্লাহ্‌র জিকির, মহব্বত ও মারেফত এতো সহজে অন্য কোনো পন্থায় লাভ করা যায় না। এ সম্পর্কে আরো বেশী করে জানতে চাইলে আমাদের খানকা থেকে প্রকাশিত অন্যান্য বইপত্র পড়তে হবে। আরো পড়তে হবে 'মকতুবাত শরীফ' (মকতুবাতে ইমামে রব্বানী)।

ইমামে রব্বানী হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. সকল তরিকার কামালিয়ত অর্জন করেছিলেন। সবশেষে হজরত খাজা বাকী বিল্লাহ র. এর কাছ থেকে গ্রহণ করেন নকশ্‌বন্দিয়া তরিকা। তিনি ছিলেন দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মোজাদ্দেদ বা সংস্কারক। সংস্কারের মহান কর্মকাণ্ডের অনুকূল হিসাবে নকশ্‌বন্দিয়া তরিকাই ছিলো তাঁর কাছে অধিক গুরুত্ববহ। মকতুবাত শরীফের বহু স্থানে নকশ্‌বন্দিয়া তরিকার প্রশংসা করেছেন তিনি। কলব গোপন। শয়তানও গোপন। গোপন স্থানে গোপন শত্রু বসে থাকে। তাকে উৎখাত করতে গেলে তো গোপন অস্ত্রই প্রয়োজন। প্রয়োজন জিকরে খফির (গোপন জিকিরের)। নকশবন্দিয়া তরিকা সুন্নতে রসুলের উপর পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত। দ্বীনের সংস্কার মানেই তো সুন্নতের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা।

যেখানে রোগ। সেখানেই তো ওষুধ লাগাতে হবে। যেখানে পচন শুরু হয়েছে, অস্ত্রপচার তো করতে হবে সেখানেই। রোগ তো কলবে, সুতরাং জিকির দিতে হবে কলবে। মুখের জিকিরে চলবে না। এভাবে গোপন কলবে গোপন জিকির করে গোপন শত্রু উৎখাত করে গোপনতম (গায়েব) সত্তার প্রতি ধাবিত হবো আমরা। ধাবিত হবো ভালোবেসে। ভালোবাসাও তো গোপনই। এভাবে আমরা আল্লাহ্‌প্রেমিকের দলে দলবদ্ধ হয়ে যাত্রা করবো আল্লাহ্‌র দিকে। এই দল সম্পর্কেই কবি বলেছেন—

আশ্চর্য নায়ক বটে নকশ্‌বন্দিগণ
সদলে গোপন পথে করে বিচরণ
ইহাদের সংসর্গেতে সাধকের মন
নির্জনতা, চিল্লাকাশি করে বিসর্জন।

অসংখ্য মানুষকে তিনি ও তাঁর খলিফাগণ এই গোপন পথে আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন করেছেন। এখন পর্যন্ত তাঁর সেই শিক্ষা ও প্রতিপালনের (তালিম ও তরবিয়তের) ধারা বয়ে চলেছে। যা গোপন, তা গোপন থাকাই শোভন। কিন্তু মানুষের জন্য তাঁর সীমাহীন ভালোবাসার কারণে তিনি তাঁর লেখনী ও বিবৃতির মাধ্যমে সবাইকে এই প্রেমপথে সমর্পিত হতে বলেছেন—

আফসোস যদিও করে দুনিয়ার লোক
তবুও গোপন থাক প্রেমের আলোক,
আমি কিন্তু করিলাম ইহার বয়ান
ব্যথিত না হয় যেনো কাহারো পরান।

এখন আমরা তরিকায় বায়াত হওয়ার পর যে সকল জিকির অজিফার নির্দেশ লাভ করি, সেগুলোর কিছু ফযীলত বর্ণনা করতে চাই। এগুলো জানতে পারলে আমরা একথাও মানতে বাধ্য হবো যে, সমস্ত জিকির ও নেক আমলের সার নির্যাস হচ্ছে আমাদের প্রতিদিনের আমল। সাধারণতঃ দেখা যায় এই তরিকার সালেকবৃন্দের ফযীলত জানার ইচ্ছা কম। ফযীলতদাতার প্রতিই তাঁদের থাকে সার্বক্ষণিক দৃষ্টি। এরকম হবেই বা না কোনো, তাঁরা তো পথ ধরেছেন মুকার্‌রবীনগণের। আবরারগণের দিকে দৃষ্টি দিবার সময় তাদের নেই। বায়াত হওয়ার পরক্ষণেই যে দোয়া তাঁরা বলতে আদিষ্ট হয়েছেন, তা হচ্ছে 'ইয়া ইলাহী! মকসুদ মেরা তুহি রেজায়ি তেরী মুঝকো রহমত, মহব্বত ও মারেফত নসিবে আতাকুন' (ইয়া আল্লাহ্! আমার উদ্দেশ্য কেবল তুমি ও তোমার সন্তুষ্টি। আমাকে দান করো তোমার রহমত, মহব্বত ও মারেফত)। এই দোয়ার মধ্যে সওয়াব চাওয়ার কথা নেই। আছে রহমত, মহব্বত ও মারেফতের কথা।

যাহোক, বায়াত হওয়ার সাথে সাথে আমাদেরকে ইসমে আজম আল্লাহ্‌র জিকির করতে বলা হয়। আমাদের পীর ও মোর্শেদ ইমামুল আউলিয়া হজরত হাকিম আবদুল হাকিম নতুন বায়াত গ্রহণকারীকে কলবের অবস্থান তাঁর পবিত্র তর্জনি দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বলতেন, এইখানে মারেফতের প্রথম মাকাম কলব। এখানে খেয়াল রেখে মুখ নড়বে না, ঠোঁট নড়বে না, শরীর দুলবে না, কোনো শব্দ হবে না— চলাফেরা, ওঠাবসা, ওজু-বেওজু, পাক-নাপাক সব সময় মনে মনে আল্লাহ্ আল্লাহ্ জিকির করবেন।

এরকমই ছিলো হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. এর নির্দেশ। যেমন— 'প্রারম্ভে জিকির করা ব্যতীত উপায় নেই। তোমার কর্তব্য এই যে, ছনুবর বৃক্ষের মতো আকৃতিধারী কলবের প্রতি লক্ষ্য করো। যেহেতু উহা সূক্ষ্ম জগতস্থিত প্রকৃত কলবের আধার স্বরূপ। তারপর পবিত্র নাম 'আল্লাহ্' কলবে পরিচালিত করতে থাকো। ইচ্ছাকৃতভাবে শরীরের কোনো অঙ্গ আন্দোলিত করিও না। পূর্ণরূপে কলবের প্রতি মনোযোগী হইও। কলবের আকৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিও না। কেননা কলবের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। কলবের আকৃতির প্রতি নয়। অতঃপর পবিত্র

‘আল্লাহ্’ শব্দকে প্রকারবিহীন (বেমেছাল) ধারণা করিও, কোনো গুণ (সিফাত) তার সাথে মিশ্রিত কোরো না। মকতুব নং ১৯০, প্রথম খণ্ড।

হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, দুনিয়ার মহব্বত সমস্ত গোনাহের মূল। ‘আল্লাহ্’ হচ্ছে আল্লাহ্র মূল নাম। সুতরাং এটাই স্বাভাবিক যে, কলব থেকে মূল গোনাহ্ দূর করতে হলে মূল জিকিরই লাগবে। ‘আল্লাহ্’ নামই ইসমে আজম। বলা হয়ে থাকে, কোরআনুল করীমে ‘আল্লাহ্’ নামের উল্লেখ করা হয়েছে দুই হাজার তিন শত ষাট বার।

আল্লামা শামী রহ. ইমাম আবু হানিফা রহ. এর উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন, ইসমে আজম হচ্ছে ‘আল্লাহ্’। তিনি আরো লিখেছেন, ইমাম তাহাবী এবং আরো অনেক আলেম একথাই বলেছেন। অধিকাংশ আরেফ ও সুফীগণের অভিমতও এরকম। তাই তাঁরা সকলেই ‘আল্লাহ্’ ‘আল্লাহ্’ জিকির বেশী বেশী করে করতে বলেন।

হজরত বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী কুদ্দিসা সিররূহ বলেছেন, ইসমে আজম হচ্ছে ‘আল্লাহ্’। তবে শর্ত হলো, যখন তুমি এই পবিত্র নাম জিকির করবে, তখন আল্লাহ্র খেয়াল ছাড়া অন্য কোনো কিছুর খেয়াল যেনো তোমার অন্তরে না থাকে।

ইসমে আজম পড়ে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয়। তাই আমাদেরকে তসবি ধরে গুণে আল্লাহ্ আল্লাহ্ জিকিরও করতে বলা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে, ১০০ বার ‘আল্লাহ্’ জিকির করার পর এই দোয়া করতে— ‘ইয়া ইলাহী! মকসুদ মেরা তুহি, রেজায়ি তেরি, মুঝকো রহমত, মহব্বত ও মারেফত নসিবে আতাকুন’। বলা বাহুল্য, এই দোয়া কবুলও হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে মুরিদগণের কলব আল্লাহ্র জিকিরে জিন্দা হয়ে যায়।

‘জামেউল উসুল’ কিতাবে আছে ‘আল্লাহ্’ জিকির ওজিফা হিসাবে কমপক্ষে পাঁচ হাজার বার পড়তে হবে। বেশীটির জন্য কোনো সীমা নির্ধারিত নেই। আর সুফিগণের জন্য দৈনিক পঁচিশ হাজার বার।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্

এই জিকির করতে বলা হয় দায়রায়ে মা'ইয়াত (ফানা ফির রসুল) মাকামে সবক দেওয়ার পর। এই জিকিরের ফযীলত সম্পর্কে হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, রসুলে আকরম স. এরশাদ করেন, সর্বোত্তম জিকির হলো ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’, আর সর্বোত্তম দোয়া হলো‘ আলহামদু লিল্লাহ্’। মেশকাত, তিরমিজি, ইবনে মাজা।

মোল্লা আলী ক্বারী র. বলেন, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, সমস্ত জিকিরের মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ জিকির হলো কলেমায়ে তাইয়্যেবা (লা ইলাহা ইল্লাল্লহ্)। কেননা এটাই ধর্মের মূল ভিত্তি। পূর্ণ দ্বীন এই কলেমার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। দ্বীন এই পবিত্র বাক্যকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। এই কারণেই সম্মানিত সুফী ও আরেফগণ এই কলেমাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেন এবং তাঁদের অনুসারীগণকে এই কলেমার জিকির অত্যধিক পরিমাণে করতে বলেন। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে, এই কলেমার জিকির দ্বারা যেরকম উপকারিতা পাওয়া যায়, অন্য কোনো আমলের দ্বারা সেরকম উপকারিতা পাওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। ঘটনাটি এই— সাইয়্যেদ আলী ইবনে মাইমুন মাগরেবী র. ছিলেন একজন স্বনামধন্য সুফী ও আরেফ। তাঁর পবিত্র সান্নিধ্যে একবার উপস্থিত হলেন বিখ্যাত আলেম ও মুফতী শায়েখ উলওয়ান হামাভী। সাইয়্যেদ সাহেব তাঁর প্রতি তাঁর মনোযোগ নিবদ্ধ করলেন। বললেন, শিক্ষকতা, ফতওয়া দান— এসকল কাজ বন্ধ করে দিন। সব সময় জিকির করতে থাকুন। তিনি তাই করলেন। সাধারণ মানুষের কাছে এই সংবাদ পৌঁছলে তারা বিভিন্ন প্রকার মন্তব্য করতে শুরু করলো। কেউ বললো, শায়েখ তো ধ্বংস হয়ে গেলেন। তাঁর এলেম থেকে মানুষ বঞ্চিত হয়ে গেলো ইত্যাদি। কিছু দিন পর সাইয়্যেদ সাহেব তাঁকে বললেন, আপনার প্রতিদিনের কোরআন তেলাওয়াতও বন্ধ করে দিন। শায়েখ তাই করলেন। জনমানসে এর প্রতিক্রিয়া হলো আরো তীব্র। তারা বলতে শুরু করলো, এ হচ্ছে প্রকাশ্য ধর্মহীনতা ও ধর্মদ্রোহিতা। শায়েখ কারো কথায় কর্ণপাত করলেন না। মোর্শেদের হুকুমে অত্যধিক জিকিরের মধ্য দিয়ে সময়াতিপাত করতে লাগলেন। এক সময় আল্লাহ্‌র জিকিরে তাঁর কলব পরিপূর্ণ হয়ে গেলো। হলো প্রশান্ত। তখন তাঁর পীর মোর্শেদ সাইয়্যেদ আলী ইবনে মাগরেবী বললেন, এবার কোরআন তেলাওয়াতের আমল শুরু করে দিন। শায়েখ তাই করলেন। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন, কোরআন মজীদের প্রতিটি শব্দে রয়েছে গভীর এলেম এবং গূঢ় মারেফত— যা বর্ণনা করে শেষ করা যায় না।

এই কলেমা যেহেতু দ্বীনের ভিত্তি এবং ইমানের মূল, তাই এর জিকির যতো বেশী করা হবে ততই সুদৃঢ় হবে দ্বীনদারী। এই কলেমার উপরেই ইমান প্রতিষ্ঠিত। বরং গোটা জগতের অস্তিত্বই এই কলেমার উপরে নির্ভরশীল। যেমন সহীহ্ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, যতোদিন পৃথিবীর বুকে একজনও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার লোক থাকবে, ততোদিন পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। অন্য এক হাদিসে এসেছে, যতদিন পর্যন্ত জমিনের বুকে একজন 'আল্লাহ্' 'আল্লাহ্' বলার লোক থাকবে, ততোদিন পর্যন্ত কিয়ামতের আগমন ঘটবে না।

রসুলে আকরম স. এরশাদ করেছেন, একবার নবী মুসা আল্লাহ্পাকের দরবারে নিবেদন করলেন, হে আমার আল্লাহ্! আমাকে এমন কোনো অজিফা শিক্ষা দিন, যার দ্বারা আমি আপনার জিকির করবো, আপনাকে ডাকবো। আল্লাহ্পাক নির্দেশ করলেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়তে থাকো। তিনি নিবেদন করলেন, হে আমার প্রভুপালক! এটাতো সবাই পড়ে। আল্লাহ্পাক পুনঃ নির্দেশ দিলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে থাকো। তিনি পুনঃ নিবেদন করলেন, হে আমার প্রিয় পরওয়ারদিগার! আমি এমন অজিফা প্রত্যাশী, যা কেবল আমাকেই দান করা হয়। এরশাদ হলো— হে মুসা! সপ্ত আকাশ এবং সপ্তস্তরসম্ভূত মৃত্তিকা যদি এক পাল্লায় রাখা হয়, আর অপর পাল্লায় রাখা হয় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর পাল্লাই হবে অধিক ভারী।

হজরত আবু হোরায়রা রা. একবার রসুলে আকরম স. কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! কিয়ামতের দিন আপনার শাফায়াত দ্বারা কোন্ ব্যক্তি অধিক উপকৃত হবে? তিনি স. বললেন, হাদিসের প্রতি তোমার অনুরাগ দেখে আমার ধারণা হয়েছিলো তোমার আগে এ ব্যাপারে আমাকে আর কেউ প্রশ্ন করবে না। (তবে শোনো) আমার শাফায়াত দ্বারা ওই ব্যক্তি সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ও উপকৃত হবে, যে বিশুদ্ধ অন্তরে বলবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। বোখারী।

হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম রা. বলেন, রসুলে করীম স. এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ইখলাসের সঙ্গে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্র বাণীবাহক! কলেমার ইখলাস আবার কী? তিনি স. বললেন, হারাম কাজ থেকে মুক্ত থাকা। তিবরানী।

'এহ্ইয়াউল উলুম' রচয়িতা লিখেছেন, একবার রসুলে করীম স. ভাষণ দান করলেন। ওই ভাষণের একস্থানে তিনি স. বললেন, যে ব্যক্তি অশুদ্ধতার মিশ্রণ না ঘটিয়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হবে। হজরত আলী রা. নিবেদন করলেন, হে প্রেরিত পুরুষ! এখানে অশুদ্ধতার অর্থ কী? তিনি স. বললেন, দুনিয়ার মহব্বত ও দুনিয়া অনুসন্ধানী হওয়া। এমন অনেক লোক আছে, যারা কথা বলে নবীদের মতো, কিন্তু কাজ করে দাম্ভিক ও জালেমদের মতো। যারা ওরকম না হয়ে বিশুদ্ধ অন্তরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে, জান্নাত ওয়াজিব হয় তাদের জন্য।

তারগীব ও তিরমিজি গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, কোনো বান্দা এমন নেই, যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, অথচ তার জন্য আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয় না। এই কলেমা সোজা আরশে পৌঁছে যায়। তবে শর্ত এই যে, এই কলেমা পাঠকারীকে বেঁচে থাকতে হবে কবীরা গোনাহ্ থেকে।

হজরত শাদ্দীদ রা. কর্তৃক বর্ণিত এবং হজরত উবাদা রা. সমর্থিত হাদিসে এসেছে, একবার আমরা রসুলেপাক স. এর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত ছিলাম। তিনি স. বললেন, এই সমাবেশে কোনো অপরিচিত (অমুসলিম) নেই তো? আমরা বললাম, না। তিনি স. বললেন, দরোজা বন্ধ করে দাও। দরোজা বন্ধ করা হলে বললেন, হাত ওঠাও। বলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। আমরা কিছুক্ষণ হাত উঠিয়ে রাখলাম (এবং কলেমা তাইয়্যেবা পড়লাম)। অতঃপর তিনি স. বললেন, আলহামদুলিল্লাহ্! হে আমার আল্লাহ্! তুমি আমাকে এই কলেমাসহ প্রেরণ করেছো এবং এই কলেমার জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছো। আর তুমি কখনোই প্রতিশ্রুতিভঙ্গকারী নও। এরপর তিনি স. আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, শুভ সংবাদ শ্রবণ করো। আল্লাহ্তায়ালা তোমাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন।

হজরত আবু হোরায়রা রা. কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুলে আকরম স. এরশাদ করেছেন, তোমরা বেশী বেশী লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ সাক্ষ্য দিতে থাকো ওই সময় সমুপস্থিত হবার পূর্বে, যখন আর এই কলেমা উচ্চারণের সুযোগ থাকবে ন। তারগীব, আবু ইয়ালা।

হজরত আমর রা. কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুলেপাক স. এরশাদ করেছেন, আমি এমন একটি কলেমা জানি, ওই কলেমাকে যদি কেউ অন্তরের বিশ্বাসের সঙ্গে পাঠ করে এবং ওই অবস্থায় মৃতুবরণ করে, তবে সে জাহান্নামের জন্য হারাম হয়ে যাবে। ওই কলেমা হচ্ছে— লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। তারগীব, হাকেম।

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্র রসুল স. বলেন, জান্নাতের চাবিসমূহ হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র সাক্ষ্য প্রদান। মেশকাত, আহ্মদ। অন্য এক হাদিসে এসেছে, জান্নাতের মূল্য হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।

হজরত আনাস রা. বর্ণনা করেছেন, রসুলে মকবুল স. এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি দিনে অথবা রাতে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পড়ে, তার আমলনামা থেকে গোনাহ্সমূহ মুছে যায় এবং তদস্থলে লিখে দেওয়া হয় পুণ্যসমূহ। তারগীব, আবু ইয়ালা।

হজরত আবু হোরায়রা রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসেছে, রসুলে আকরম স. বলেছেন, আরশের সামনে রয়েছে একটি নূরের স্তম্ভ। কেউ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বললে ওই স্তম্ভটি দুলতে থাকে। আল্লাহ্ তখন বলেন, স্থির হও। সে বলে, কীভাবে স্থির হবো— কলেমা পাঠকারীকে তো এখনো মাফ করা হলো না। আল্লাহ্ বলেন, আচ্ছা, তাকে মাফ করে দিলাম। একথা শুনে স্তম্ভটি সুস্থির হয়ে যায়।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসেছে, রসুলে রহমত স. বলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ওয়ালাদের না কবরে ভয় আছে, না ভয়

আছে হাশরের ময়দানে। ওই দৃশ্য যেনো আমার চোখের সামনে ভাসছে— তারা নিজেদের মস্তক থেকে মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে তাদের কবর থেকে উঠছে এবং বলছে, সকল প্রশংসা ওই পবিত্র জাতের জন্য যিনি আমাদের উপর থেকে (চিরদিনের জন্য) দুঃখ-দুঃশ্চিন্তা দূর করে দিয়েছেন। অন্য এক হাদিসে এসেছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ওয়ালারা না মৃত্যুর সময় ভীত হবে, না ভীত হবে কবরে। তারগীব, তিবরানী, বায়হাকী।

হজরত ইবনে আব্বাস রা. কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, নবীয়ে রহমত স. বলেছেন, ওই পবিত্র সত্তার শপথ, আমার জীবন রয়েছে যাঁর করায়ত্তে, যদি সকল আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যের সকলকিছুকে এক পাল্লায় রাখা হয় এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র সাক্ষ্য রাখা হয় অপর পাল্লায়, তবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্র পাল্লাই হবে অধিক ভারী। দুররে মানসুর, তিবরানী।

হজরত ইবনে আব্বাস রা. কর্তৃক আরও বর্ণিত হয়েছে, নবীয়ে আখেরুজ্জামান স. এরশাদ করেন, জান্নাতের দরোজায় লিখিত আছে 'ইন্নানি আনাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা আনা লাউআযযিবু মান ক্বালাহা' (আমিই আল্লাহ্। আমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই— যে ব্যক্তি এ কথার সাক্ষ্য দান করবে, আমি তাকে আযাব দিবো না)।

হজরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আমি রসুলে আকদাস স. কে বলতে শুনেছি— আমার কাছে জিব্রাইল আমীন বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু স্বয়ং বলেন, আমিই আল্লাহ্। আমি ছাড়া আর কেনো উপাস্য নেই। অতএব কেবল আমারই উপাসনা করো। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ইখলাসের সঙ্গে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র সাক্ষ্যসহ আমার সমীপে উপস্থিত হবে, সে আমার দুর্গে প্রবেশ করবে। আর যে আমার দুর্গমধ্যে প্রবেশ করবে, সে হবে আমার শাস্তি থেকে নিরাপদ। দুররে মানসুর, হিলিয়া।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, নবীয়ে পাক স. বলেছেন, সকল জিকিরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জিকির লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। আর সকল দোয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ দোয়া হচ্ছে ইস্তেগফার। অতঃপর তিনি স. তাঁর কথার সমর্থনে পাঠ করলেন সুরা মোহাম্মদের এই আয়াত– 'ফা'লাম আননাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' (সুতরাং জেনে রাখো, আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই, ক্ষমাপ্রার্থনা করো তোমার এবং মুমিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য)। আয়াত নং ১৯।

হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. রসুলে আকদাস স. এর একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন এভাবে— 'তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' এবং ইস্তেগফার খুব বেশী করে পড়তে থাকো। কেননা শয়তান বলে, আমি মানুষকে পাপ দ্বারা ধ্বংস করি, আর

মানুষ আমাকে ধ্বংস করে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' এবং ইস্তেগফার দ্বারা। দুররে মানসুর, আবু ইয়ালা।

হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. বর্ণনা করেছেন, সর্বশেষ নবী স. বলেছেন, যে ব্যক্তি খাঁটি দিলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'র সাক্ষ্যসহ মৃত্যুবরণ করবে, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। অপর এক হাদিসে আছে, অবশ্যই আল্লাহ্ তাকে মাফ করে দিবেন। দুররে মানসুর, আহ্মদ, নাসাঈ।

হজরত আবু যর গিফারী রা. বর্ণনা করেছেন, একবার আমি নিবেদন জানালাম, হে আল্লাহ্র বচনবাহক! আমাকে ওসিয়ত করুন। তিনি স. বললেন, তোমার দ্বারা যদি কোনো অন্যায় কাজ সম্পাদিত হয়, তবে সাথে সাথে কোনো নেক আমল সম্পাদন কোরো (যাতে অন্যায় কর্মের প্রভাব মুছে যায়)। আমি বললাম, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠ করাও কি নেক আমল? তিনি স. বললেন, এটা তো নেক আমলসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আহ্মদ।

হজরত ওসমান রা. বর্ণনা করেছেন, রসুলে আক্দাস স. বলেছেন, আমার এমন একটি কলেমা জানা আছে, যদি কেউ তাকে সত্য বলে বিশ্বাস ক'রে পাঠ করে, তবে তার উপরে জাহান্নামের আগুন হয়ে যায় হারাম। সেখানে উপস্থিত হজরত ওমর বললেন, আমি কি বলবো, ওই কলেমা কোনটি? ওটি হচ্ছে ওই কলেমা, যার দ্বারা আল্লাহ্তায়ালা তাঁর রসুল ও তাঁর সাহাবীগণকে সম্মানিত করেছেন। আর যে কলেমা আল্লাহ্র রসুল তাঁর পিতৃব্য আবু তালেবের সম্মুখে উপস্থিত করেছিলেন তার মৃত্যুর বেলায়। আর ওই কলেমা হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'।

হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. একবার বিষণ্ন মনে উপস্থিত হলেন রসুলুল্লাহ্ স. এর পবিত্র সাহচর্যে। রসুলুল্লাহ্ স. জিজ্ঞেস করলেন, বিষণ্ন কেনো? তিনি বললেন, গত রাতে আমার চাচাতো ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। সে সময় আমি তার শয্যাপাশে উপস্থিত ছিলাম। রসুলুল্লাহ্ স. জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তাকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পড়িয়েছিলে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রসুলুল্লাহ্ স. বললেন, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়েছে। হজরত আবু বকর বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! জীবিত লোকেরা যদি এই কলেমা পড়ে, তবে কী হবে? রসুলুল্লাহ্ দুই বার বললেন, এই কলেমা তাদের পাপসমূহকে নিশ্চিহ্ন করে দিবে। মা যাওয়ায়িদ, আবু ইয়ালা।

গোয়ালিয়ার কেল্লায় বন্দী অবস্থায় হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. তাঁর তৃতীয় সাহেবজাদা হজরত খাজা মোহাম্মদ মাসুম র. এর নিকট লিখিত একটি পত্রে উল্লেখ করেছেন, এই তিনটি বিষয়কে ওজীফা বানিয়ে নিয়ো— ১.

কোরআন মজীদ তেলাওয়াত ২. দীর্ঘ ক্বেরাতের সঙ্গে নামাজ আদায় এবং ৩. কলেমা তাইয়্যেবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্’র বিরতিহীন জিকির। ‘লা’ কলেমার দ্বারা নফসের মিথ্যা মাবুদগুলোকে অপসারিত করো। নিজের উদ্দেশ্য ও আকাঙ্খিত বস্তুসমূহকে নিশ্চিহ্ন করো। নিজের আকাঙ্খিত বস্তুসমূহ মিথ্যা মাবুদ ছাড়া অন্য কিছু নয়। হৃদয়ের প্রান্তরে যেনো ইচ্ছা-আকাঙ্খা অবশিষ্ট না থাকে। এখানেই বান্দার প্রকৃত সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়।

লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্

দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণের জন্য এবং বিপদাপদ দূর করার জন্য হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. অধিক সংখ্যায় ‘লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্’ পাঠ করতে পছন্দ করতেন। এর পরিমাণ তিনি নির্ধারণ করেছেন এভাবে— লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্ পাঁচ শত বার এবং এর পূর্বে ও পরে এক শত বার করে দরূদ শরীফ।

রসুলে আক্দাস স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্পাকের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত কোনো বিশেষ নেয়ামতকে কেউ যদি স্থায়ীভাবে ধরে রাখতে চায়, তবে সে যেনো অধিক সংখ্যায় পাঠ করে লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্। হজরত উবায়দা ইবনে আমের থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তিবরানী। আর সুপরিণত সূত্রে হজরত আবু মাওলা থেকে বোখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা বেহেশতের গুপ্ত ধনভাণ্ডারের অন্যতম। নাসাঈ’র বর্ণনায় এসেছে, লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্ নিরানব্বইটি রোগের নিরাময়, তার মধ্যে ন্যূনতম রোগ হচ্ছে দুঃশ্চিন্তা।

‘লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্’ সম্পর্কে এই বিবরণটি এখানে উপস্থাপন করা হলো তাফসীরে মাযহারী ১১তম খণ্ডের পৃষ্ঠা ৫৬০ থেকে। এখন উল্লেখ করা হচ্ছে আরো কিছুসংখ্যক হাদিস।

১. হজরত আবু হোরায়রা রা. কর্তৃক বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রসুলুল্লাহ্ স. একবার আমাকে বললেন, লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা বেশী করে পাঠ কোরো। কেননা, এটা বেহেশতের ভাণ্ডারের একটি বিশেষ কালাম। মেশকাত।

২. হজরত আবু হোরায়রা রা. বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. এরশাদ করেছেন, লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্ নিরানব্বইটি ব্যাধির ঔষধ। সেগুলোর সবচেয়ে ছোটটি হলো দুশ্চিন্তা। মেশকাত।

৩. হজরত আবু মুসা আশআরী রা. কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একদা সাহাবীগণ রসুলেপাক স. এর সঙ্গে সানিয়া নামক এক ঘাঁটিতে আরোহণ করছিলেন। উঁচু

টিলায় ওঠার সময় এক লোক উচ্চস্বরে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' এবং 'আল্লাহু আকবর' বলছিলো। রসুলুল্লাহ্ স. বললেন, তোমরা তো কোনো বধির কিংবা অনুপস্থিত সত্তাকে আহ্বান করছো না। এরপর তিনি স. বললেন, হে আবু মুসা! অথবা হে আবদুল ইবনে কায়েস! আমি কি তোমাকে এমন একটি বাক্য শিক্ষা দিবোনা, যা জান্নাতের ভাণ্ডার তুল্য? আমি বললাম, নিশ্চয়ই। তিনি স. বললেন, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্'। মুসলিম, বোখারী।

দরূদ শরীফ

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا -

(নিশ্চয় আল্লাহ্ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করো এবং তাঁকে যথাযথভাবে সালাম জানাও)। সুরা আহযাব, আয়াত ৫৬।

হজরত আবু হোরায়রা রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে এসেছে, রসুলে আক্দাস স. বলেছেন, ওই ব্যক্তির নাসিকা ধূলিধূসরিত হোক, যে আমার নাম শুনে দরূদ পাঠ করে না। মৃত্তিকায়িত হোক ওই ব্যক্তির নাকও, যে রমজান পেলো অথচ মাফ করিয়ে নিতে পারলো না তার পাপরাশি। আর ধূলায়িত হোক ওই লোকের নাসিকা, যে তার বৃদ্ধ পিতামাতার যে কোনো একজনকে পেয়েও অর্জন করতে পারলো না জান্নাত। তিরমিজি, ইবনে হাব্বান।

হজরত জাবের ইবনে সামুরা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুলে রহীম স. বলেছেন, যার সামনে আমার নাম উল্লেখ করা হলো, অথচ তা শুনে সে আমার উপরে দরূদ পাঠ করলো না, সে যদি নরকে প্রবেশ করতে চায় তো করুক। আল্লাহ্ যদি তাকে দূরেই রাখতে চান তো রাখুন।

সুপরিণত সূত্রে হজরত ইবনে আব্বাস রা. কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুলে রউফ স. এরশাদ করেছেন, একবার জিব্রাইল আমাকে বললেন, যার সামনে আপনার নাম উচ্চারণ করা হলো, অথচ তা শুনেও যে আপনার উদ্দেশ্যে দরূদ পাঠ করলো না, সে যদি দোজখে যেতে চায়, তবে আল্লাহ্ তাকে দূরেই রেখে দিন। হাদিসদ্বয় সংকলন করেছেন তিবরানী।

আবদুর রহমান ইবনে আবী লায়লা বর্ণনা করেছেন, একবার আমার সাক্ষাৎ ঘটলো হজরত কা'ব ইবনে উজরার সঙ্গে। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি হাদিস উপহার দিবো, যা আমি রসুলে আকবর স. এর নিকট থেকে শুনেছি স্বকর্ণে। আমি বললাম, অবশ্যই। তিনি বললেন, একবার আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক! আমরা তো জানি কীভাবে আপনাকে সালাম করতে হয়। কিন্তু আপনার প্রতি এবং আপনার বংশধরগণের প্রতি দরূদ পাঠ করতে হয় কীভাবে, তাতো আমরা জানি না। তিনি স. বললেন, এভাবে— আল্লাহুম্মা সল্লি আ'লা মুহাম্মদ ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মদ কামা সল্লাইতা আ'লা ইব্‌রহীমা ওয়া আ'লা আলি ইব্‌রহীমা ইন্নাকা হামীদুম্‌ মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আ'লা মুহাম্মদ ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মদ কামা বারকতা আ'লা ইব্‌রহীম ওয়া আ'লা আলি ইব্‌রহীমা ইন্নাকা হামিদুম্‌ মাজীদ। বোখারী, মুসলিম। মুসলিমের বর্ণনায় আ'লা ইব্‌রহীম' এর স্থলে এসেছে 'ওয়া আ'লা আলি ইব্‌রহীম।

হজরত আবু হোরায়রা রা. কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুলুর রহমান স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপরে দরূদ পাঠ করবে একবার, আল্লাহ্‌ তার উপরে রহমত বর্ষণ করবেন দশবার। মুসলিম। হজরত আনাস রা. কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পড়বে, আল্লাহ্‌ তার উপরে রহমত বর্ষণ করবেন দশবার। মার্জনা করবেন তার দশটি পাপ এবং তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন দশগুণ। বোখারী, আহ্‌মদ, নাসাঈ, হাকেম। হাকেম বলেছেন, হাদিসটি যথাসূত্রসম্বলিত। হজরত ইবনে মাসউদ রা. কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহাবিচারের দিবসে ওই ব্যক্তি হবে আমার অধিক নৈকট্যভাজন, যে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করবে অত্যধিক। তিরমিজি। তাঁর নিকট থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, রসুলুর রহমান স. বলেন, ধরাপৃষ্ঠে কিছুসংখ্যক ফেরেশতা থাকে পরিভ্রমণরত। উম্মতের সালাম আমার কাছে পৌঁছে দেওয়াই তাদের কাজ। নাসাঈ, দারেমী।

হজরত আবু হোরায়রা রা. কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুলুর রহমান স. বলেছেন, কেউ আমার কাছে সালাম প্রেরণ করলে আল্লাহ্‌ আমার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেন আমার রূহকে। তখন আমি দেই তার সালামের উত্তর। আবু দাউদ, বায়হাকী। তাঁর নিকট থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, আমি স্বকর্ণে শুনেছি, নবীয়ে রহমত স. আজ্ঞা করেছেন, তোমাদের গৃহগুলোকে কবর বানিয়ো না। আর অপরিচ্ছন্ন রেখো না আমার সমাধিকে। আর আমার প্রতি প্রেরণ কোরো নিরবচ্ছিন্ন দরূদ। তোমরা যেখানেই থাকো না কেনো, তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌঁছানো হবে।

হজরত আবু তালহা বর্ণনা করেছেন, একবার ইমামুল মুরসালিন স. আমাদের মধ্যে উপস্থিত হলেন প্রফুল্ল বদনে। বললেন, জিব্রাইল এই মাত্র বলে গেলেন, আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করেছেন, তুমি আমার প্রিয়তম নবীকে গিয়ে বলো, তিনি কি একথা জেনে খুশী হবেন না যে, যে ব্যক্তি তাঁর উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, আমি তার উপরে রহমত বর্ষণ করবো দশবার? আর যে তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ করবে, আমি তার উপরে শান্তি বর্ষণ করবো দশবার? নাসাঈ, দারেমী।

হজরত উবাই ইবনে কা'ব বর্ণনা করেছেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসুল! আমি আপনার উপর অগণিত বার দরূদ পাঠ করি। তাই জানতে চাই, এর কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা আছে কি? তিনি স. বললেন, যতোবার ইচ্ছা ততোবারই পাঠ করতে পারো। যতো বেশী পাঠ করবে, ততোই উপকৃত হবে। আমি বললাম, যদি আমি আমার জিকির ও দোয়ার এক চতুর্থাংশ সময় দরূদ শরীফের জন্য নির্ধারণ করি? তিনি স. বললেন, তা-ও করতে পারো। তবে যতো করবে ততোই লাভ। বললাম, যদি নির্ধারণ করি দুই তৃতীয়াংশ সময়? তিনি স. বললেন, তা-ও করতে পারো। তবে যতো করবে ততোই মঙ্গল। পুনরায় বললাম, যদি আমার দোয়া-প্রার্থনার পুরোটা সময় নির্ধারণ করি কেবল দরূদ শরীফের জন্য? তিনি স. জবাব দিলেন, তাহলে তো তিরোহিত হবে সকল দুঃশ্চিন্তা। পূর্ণ হবে মনোস্কামনা। আর নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে যাবতীয় পাপরাশি। তিরমিজি।

হজরত আবু হোরায়রা রা. বর্ণনা করেছেন, রসুলে আজম স. আজ্ঞা করেছেন, আমার একথা জেনে যদি কেউ আনন্দিত হতে চায় তবে সে শুনে রাখুক, কেউ যদি আমার পরিবার-পরিজনদের জন্য দোয়া করে, তবে সে কল্যাণ লাভ করবে তার গোটা পরিবারের জন্য। আর সে যেনো দোয়া করে এভাবে— আল্লাহুম্মা সল্লি আ'লা মুহাম্মাদিনি নবীয়্যিল উম্মি ওয়া জুররিয়্যাতিহি ওয়া আহলি বাইতিহী কামা সল্লাইতা আলা ইব্রহীম ইন্নাকা হামিদুম্ মাজীদ। আবু দাউদ।

হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বলেছেন, যে ব্যক্তি রসুলেপাক স. এর প্রতি দরূদ পাঠ করে একবার, আল্লাহ্ এবং তাঁর ফেরেশতারা তার উপরে করুণা বর্ষণ করেন সত্তর বার।

হজরত রওয়াইফা বর্ণনা করেছেন, রসুলেপাক স. বলেছেন, ওই ব্যক্তির জন্য আমার শাফায়াত করা হবে ওয়াজিব, যে ব্যক্তি দরূদ পাঠকালে বলবে 'আল্লাহুম্মা আন্‌ফিহুল মাকআ'দাল মুক্বর্‌রবা ইনদাকা ইয়াওমাল ক্বিয়ামাতি ওয়াজাবাত্ লাহু শাফায়াতি' (হে আল্লাহ্! মহাবিচারের দিবসে তুমি আমাকে মোহাম্মদ স. এর নৈকট্যভাজন কোরো)।

হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. বর্ণনা করেছেন, একবার রসুলুল্লাহ্ স. গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে উপস্থিত হলেন এক উদ্যানে। সেখানে সেজদাবনত হয়ে কাটিয়ে দিলেন অনেকক্ষণ। তাঁর এমতো প্রলম্বিত সেজদা দেখে একবার আমার মনে হলো, তিনি কি তবে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করলেন? আমি তাঁর নিকটবর্তী হলাম। তিনি স. মস্তক উত্তোলন করে বললেন, কী হয়েছে? আমি আমার সংশয়ের কথা জানালাম। তিনি স. বললেন, জিব্‌রাইল আমাকে একটি শুভবারতা জানালো। বললো, আল্লাহ্ আপনার সন্তোষ সাধনার্থে বলে পাঠিয়েছেন, যে ব্যক্তি আপনার উপরে দরূদ পাঠ করবে, আমি তার প্রতি অবতীর্ণ করবো রহমত এবং যে ব্যক্তি আপনার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করবে সালাম, আমিও তাকে প্রতিদানে দিবো শান্তিসম্ভাষণ। আহ্‌মদ।

হজরত ওমর ইবনে খাত্তাব বলেছেন, রসুলের প্রতি দরূদ পাঠ না করা পর্যন্ত সকল প্রার্থনা আটকে থাকে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে, ঊর্ধ্বে উত্থিত হয় না এতোটুকুও। তিরমিজি।

আবদুল্লাহ্ ইবনে আমের ইবনে রবীয়া বর্ণনা করেছেন, আমার পিতা বলেছেন, আমি নবীয়ে রহমত স. কে বলতে শুনেছি, কেউ আমার উপরে যতোবার দরূদ পাঠ করবে, ফেরেশতারাও তার উপরে করুণা বর্ষণ করবে ততোবার। এখন আল্লাহ্‌র বান্দাগণের ইচ্ছা তারা দরূদ পাঠ করবে অধিক, না অনধিক। বাগবী।

হজরত আলী রা. বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্‌র রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করবে, তার আমলনামায় পুণ্য লেখা হবে এক কীরাত। আর এক কীরাত পুণ্যের পরিমাণ উহুদ পর্বতের সমান। উত্তম সূত্রসহযোগে আবদুর রাজ্জাক হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তাঁর 'জামে' নামক গ্রন্থে।

হজরত আবু দারদা রা. বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় দশবার করে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করবে, সে অর্জন করবে আমার শাফায়াত। তিরমিজি তাঁর কবীর গ্রন্থে হাদিসটি সংকলন করেছেন উত্তমসূত্রপরম্পরা সহযোগে।

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. বলেছেন, একবার আমি রসুলুল্লাহ্‌র মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক লোক এসে তাঁকে সালাম করলো। তিনি স. তার সালামের প্রত্যুত্তর করলেন। তারপর তাকে পাশে বসালেন। কার্য সমাধার পর লোকটি চলে গেলে তিনি স. বললেন, আবু বকর! লোকটির একদিনের পুণ্যকর্ম সারা বিশ্বের পুণ্যকর্মের সমতুল। আমি বললাম, কীভাবে? তিনি স. বললেন, সে প্রতিদিন সকালে এমনভাবে আমার প্রতি দশবার দরূদ পাঠ

করে, যা হয়ে যায় সমগ্র সৃষ্টির দরূদ পাঠের সমান। আমি বললাম, আমি কি তা জানতে পারি? তিনি স. বললেন, নিশ্চয়ই। সে বলে— আল্লাহুম্মা সল্লি আ'লা মুহাম্মাদিন নাবীয়ী আদাদা মান্ সল্লা মিন্ খলক্বিকা ওয়া সল্লি আ'লা মুহাম্মদ কামা ইয়ামবাগী লানা আন্ নুসল্লি আলাইহি ওয়া সল্লি আ'লা মুহাম্মাদিন নাবীয়্যী কামা আমার তানা আন্ নুসল্লি আলাইহি ।

হজরত আবু বকর সিদ্দীক রা. আরো বলেছেন, আল্লাহ্র রসুল স. জানিয়েছেন, আমার প্রতি দরূদ পাঠ করলে এমনভাবে পাপরাশি দূর হয়, যেমন পানি দূর করে দেয় অগ্নির অস্তিত্বকে। একজন ক্রীতদাস মুক্ত করে দেওয়ার চেয়ে দরূদ পাঠ উত্তম। আর আল্লাহ্র রসুলকে ভালোবাসা আল্লাহ্র পথে বুকের তাজা রক্ত ঝরানো অপেক্ষা উত্তম। অথবা বলেছেন, উত্তম আল্লাহ্র পথে তরবারী চালনার চেয়েও।

মোরাক্বাবা

মোরাক্বাবা অর্থ ধ্যান বা ধ্যানমগ্নতা। সৃষ্টির খেয়াল পরিত্যাগ করে কেবল আল্লাহ্র খেয়ালে নিমগ্ন হওয়াই মোরাক্বাবার উদ্দেশ্য। মোরাকাবা শয়তানের সমস্ত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়। তার কলিজায় ধরিয়ে দেয় আগুন। ইতোপূর্বে একথা বলা হয়েছে এই পুস্তকের ৩৯ নং পৃষ্ঠায়।

নবীয়ে আখেরুজ্জামান স. হেরা পর্বতের চূড়ায় অবস্থিত গুহায় একাধারে ছয় মাস মোরাক্বাবা করেছিলেন। পৃথিবীর অবশিষ্ট জীবনেও তিনি স. মোরাক্বাবামুক্ত ছিলেন না। বস্তুতঃ তাঁর সমগ্র জীবন ছিলো জিকির, ফিকির, সর্বপ্রকার সৎকর্ম এবং মোরাক্বাবার এক অনন্যসাধারণ সমন্বয়। তাঁর অনুসরণ অনুগমন আমাদের জন্য অবশ্য পালনীয়। আর কলবের ফানা এবং নফসের ফানা মোরাক্বাবা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে সম্ভব নয়।

মেশকাত শরীফ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন বর্ণনা করেছেন, রসুলে মকবুল স. এরশাদ করেছেন, কোনো ব্যক্তির কিছুক্ষণ নীরব থাকায় যে মর্যাদা লাভ হয়, তা ষাট বৎসর নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম। বায়হাকী।

আরো উল্লেখ করা হয়েছে, হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, রসুলে আকরম স. একবার আবু যর গিফরীকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবু যর! তোমাকে কি এমন দু'টো সৎস্বভাবের কথা বলবো, যা ওজনে হাল্কা, কিন্তু পুণ্যের পাল্লায় খুব ভারী? তিনি বললেন, জ্বী হ্যাঁ, বলুন। রসুলে আকরম স. বললেন, দীর্ঘ নীরবতা (মোরাক্বাবা) ও উত্তম আচরণ। যাঁর হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ! বান্দা এই দু'টি উত্তম আমলের মতো আর কোনো উত্তম আমল করে না। বায়হাকী।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লাহ্ স. বলেছেন, ষাট বৎসর নফল ইবাদতের চেয়ে এক ঘন্টা সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে মোরাক্বাবা বা গভীর চিন্তা করা উত্তম।

বিখ্যাত বুজুর্গ শায়েখ আবু সাঈদকে এক লোক জিজ্ঞেস করলো, এক ঘণ্টা চিন্তা ফিকির করা অর্থাৎ আল্লাহ্র ধ্যান বা মোরাক্বাবা করা ষাট বৎসরের ইবাদতের চেয়ে উত্তম— কথাটির অর্থ কী? তিনি বললেন, নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করে এক মুহূর্ত ইবাদত করা অস্তিত্ব বজায় রেখে এক বৎসরের ইবাদতের চেয়ে উত্তম।

উল্লেখ্য, কামেলে মোকাম্মেল পীর মোর্শেদগণের খানকা ছাড়া অন্য কোথাও মোরাক্বাবার কথা শোনা যায় না। এর আমলও কোথাও নেই। খাস মোজাদ্দেদিয়া তরিকার নির্দেশনাসমূহের মধ্যে মোরাক্বাবা হচ্ছে একটি অতি আবশ্যকীয় আমল। এই তরিকার নিয়মানুসারে ফজর ও মাগরিবের নামাজের পর মোরাক্বাবায় বসতেই হয়। প্রথমে একশত বার পাঠ করতে হয় 'আল্লাহুম্মা সল্লি আ'লা মুহাম্মদিউঁ ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মদ বারিক ও সাল্লিম' তারপর পাঁচশত বার 'লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্' পুনরায় একশত বার আগের দরূদ শরীফ। তারপর সুরা ফাতেহা ১ বার এবং সুরা ইখলাস ৩ বার। তারপর 'সেজরা শরীফ' পুস্তিকাটিতে উল্লেখিত নিয়মে সওয়াব রেছানী। তারপর নিজ নিজ মাকামে মনস্থির করে করতে হয় মোরাক্বাবা।

সুরা ফাতিহা

'তাফসীরে মাযহারী' গ্রন্থে সুরা ফাতিহার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে—

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম স. এরশাদ করেছেন— আমার জীবনাধিপতি ওই পবিত্র সত্তার শপথ, সুরা ফাতিহার মতো কোনো সুরা তওরাত, যবুর, ইঞ্জিল অথবা কোরআন— কোনো আসমানী কিতাবেই নেই। এটা সেই অনুপম ও অনন্য বাণীসপ্তক, যা আল্লাহ্পাক আমাকে দান করেছেন। তিরমিজি এই হাদিসটি লিখেছেন এবং হাদিসটিকে বিশুদ্ধ এবং হাসান বলে মন্তব্য করেছেন। হাকেম বলেছেন, মুসলিমের মাপকাঠি অনুযায়ী হাদিসটি বিশুদ্ধ। হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, আমরা ক'জন রসুল স. এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। হজরত জিব্রাইলও এক পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। হঠাৎ উপরের দিকে দরোজা খোলার মতো আওয়াজ পাওয়া গেলো। হজরত জিব্রাইল আকাশের দিকে তাকালেন এবং বললেন, এই দরোজাটি আগে কখনো খোলা হয়নি। বর্ণনাকারী (হজরত ইবনে আব্বাস) বর্ণনা করেছেন, ইত্যবসরে আকাশ

থেকে এক ফেরেশতা নেমে এলেন এবং রসুল স. এর সম্মুখবর্তী হয়ে নিবেদন করলেন, এই মুহূর্তে আপনাকে দু'টি নূরের অধিকার দেওয়া হলো। যে অধিকার অন্য কোনো নবী পাননি। একটি হলো ফাতিহাতুল কিতাব এবং অপরটি হলো সুরা বাকারার শেষাংশ। এই দু'টি নূরের একটি থেকে আপনি যদি একটি বর্ণও পাঠ করেন, তবে পরিপূর্ণ নূরের অধিকারী হবেন। মুসলিম।

হজরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেন— আল্লাহ্পাক বলেছেন, আমি আমার বান্দাগণের নামাজকে দুইভাগে ভাগ করেছি। অর্ধেক আমার, আর অর্ধেক আমার বান্দাদের। বান্দারা যা চাইবে তাই পাবে। রসুল স. আরো এরশাদ করেন— যখন বান্দা বলে আলহামদুলিল্লাহ্ (সকল প্রশংসা আল্লাহ্র) তখন আল্লাহ্ বলেন, হামাদানি আব্দি (আমার বান্দা আমার অনেক প্রশংসা করেছে)। বান্দা যখন বলে, আর রহ্মানির রহীম। তখন আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা আমার খুব গুণগান করছে। বান্দা মালিকি ইয়াউমিদ্দীন বললে আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা আমার মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করছে। যখন বান্দা বলে, ইয়্যাকানা'বুদু ওয়াইয়্যাকা নাস্তাঈন। তখন আল্লাহ্ বলেন, এটা হলো আমার ও আমার বান্দার মধ্যবর্তী সেতু স্বরূপ। আমার নিকট আমার বান্দার জন্য সে বস্তুই প্রস্তুত রেখেছি যা আমার বান্দা চায়। বান্দা যখন বলে, ইহ্দিনাস্ সিরত্বল মুস্তাক্বীম; সিরাত্বল্লাজীনা আন্-আম্তা আ'লাইহিম, গইরিল মাগ্দূবি আ'লাইহিম ওয়ালাদ্দ্বল্লীন। তখন আল্লাহ্ বলেন, আমি আমার বান্দার সকল প্রার্থনা কবুল করলাম। আরো প্রার্থনা করলেও কবুল করবো। মুসলিম।

ইবনে উমাইর থেকে আবদুল মালিক মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন— সুরা ফাতিহা সকল রোগের মহৌষধ। বিশুদ্ধ সূত্রসহযোগে এ হাদিসটি দারেমী তাঁর মসনদে এবং বায়হাকী তাঁর শো'বুল ইমানে লিপিবদ্ধ করেছেন। হজরত জাবের থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. এরশাদ করেন— হে জাবের! আমি কি বলবো কোরআনের সর্বোত্তম সুরা কোনটি? হজরত জাবের বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! এরশাদ করুন। রসুল স. বললেন, সুরা ফাতিহা। হজরত জাবের বলেন, আমার মনে হলো, রসুল স. যেনো বললেন, ফাতিহা হলো সকল ব্যাধির মহৌষধ। হজরত জাবের কর্তৃক আরো বর্ণিত হয়েছে, সুরা ফাতিহা মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের প্রতিষেধক। হাদিসটি খালই তাঁর ফাওয়ায়েদ কিতাবে উল্লেখ করেছেন। সাঈদ বিন মায়াল্লী থেকে বর্ণিত হয়েছে, কোরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সুরা হচ্ছে— আলহাম্দু লিল্লাহি রব্বিল্ আলামীন। স্ব-সূত্রে ইমাম বোখারী হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বলেছেন, সুরা ফাতিহা কোরআনের দুই তৃতীয়াংশ।

আবু সুলায়মান বলেছেন, এক যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কতিপয় সাহাবী যাত্রাপথে এক মৃগী রোগীর সাক্ষাত পেলেন। সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলো। সাহাবীদের একজন সুরা ফাতিহা পাঠ করে তার কানে ফুঁ দিলেন। সে দিব্বি সুস্থ হয়ে উঠলো। রসুল স. এ ঘটনা জানতে পেয়ে এরশাদ করলেন, এরকমতো হবেই। কারণ, কোরআন জননী ফাতিহা হচ্ছে সকল ব্যাধির প্রতিষেধক। ইমাম ছা'লাবী এই বর্ণনাটি আবু সুলায়মানের উদ্ধৃতিসহ মুয়াবিয়া ইবনে সালেহ্ এর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, রসুল স. এরশাদ করেছেন— সুরা ফাতিহা বিষেরও ঔষধ। সাঈদ ইবনে মানসুর তাঁর সুনানে এবং বায়হাকী তাঁর শো'বুল ইমানে এ হাদিসটি লিখেছেন।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, আমরা প্রবাসে ছিলাম। পথ চলতে চলতে এক স্থানে থামলাম। সেখানে এক দাসী এসে বললো, এই জনপদের সর্দারকে সাপে কেটেছে। তোমাদের মধ্যে কি কোনো ওঝা আছে? সাহাবীদের একজন দাঁড়ালেন এবং দাসীর সাথে গিয়ে সুরা ফাতিহা পড়ে সর্দারের সর্পদষ্ট স্থানে ফুঁ দিলেন। লোকটি সাথে সাথে সুস্থ হয়ে গেলো। প্রবাস বাস শেষে গৃহে ফিরে আমরা রসুলেপাক স. এর নিকট ঘটনাটি জানালাম। তিনি স. ওই সাহাবীকে বললেন, তুমি কেমন করে জানলে যে, এটা একটা মন্ত্র। বোখারী।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী এবং হজরত আবু হোরায়রা থেকে আবু শায়েখ এবং ইবনে হাব্বানও এরকম হাদিস লিপিবদ্ধ করেছেন। হজরত সায়েব বিন ইয়াজিদ বলেছেন, রসুল স. সুরা ফাতিহা পাঠ করে আমার উপর ফুঁ দিয়েছেন এবং বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাঁর মুখের পবিত্র লালা আমার মুখে দিয়েছেন। আউসাত গ্রন্থে এ হাদিসটি লিপিবদ্ধ করেছেন তিবরানী। হজরত আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, শয্যায় শুয়ে সুরা ফাতিহা এবং সুরা কুল হুয়াল্লাহু আহাদ পাঠ করলে মৃত্যু ব্যতীত অন্য সকল বিপদ থেকে নিরাপদ ও নির্ভয় থাকা যায়।

সুরা ইখলাস

হজরত আবু দারদা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার বললেন, তোমরা কি প্রতি রাতে এক তৃতীয়াংশ কোরআন পাঠ করতে পারো না? আমরা বললাম, তা কী করে সম্ভব? তিনি স. বললেন, সুরা ইখলাস পুণ্যের দিক দিয়ে এক তৃতীয়াংশ কোরআনের সমতুল। হজরত আবু সাঈদ খুদরী থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন বোখারী। এরকম বর্ণনা এসেছে হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত আনাস থেকেও।

মাতা মহোদয়া আয়েশা বর্ণনা করেছেন, একবার রসুল স. এক লোককে কিছুসংখ্যক সৈন্যসহ এক অভিযানে প্রেরণ করলেন। তিনি তাঁর সৈন্যদেরকে নিয়ে নামাজ পাঠকালে প্রায়শঃ সুরা ইখলাস তেলাওয়াত করতেন। দলটি ফিরে এলে রসুল স. সমীপে সৈন্যরা বললো, তিনি এভাবে নামাজ পড়ালেন কেনো? রসুল স. বললেন, তাকেই জিজ্ঞেস করে দ্যাখো না, সে কী বলে। সৈন্যরা তাদের দলপতিকে যখন একথা বললো, তখন দলপতি বললো, এতে রয়েছে আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণবত্তার অতুলনীয় বিবরণ। তাই আমি সুরাটিকে ভালোবাসি এবং অধিকাংশ সময় এই সুরা দিয়ে নামাজ পাঠ করি। রসুল স. এর কানে যখন তারা এ জবাব পৌঁছালো, তখন তিনি স. বললেন, তাকে বলে দিয়ো, আল্লাহ্‌ তাকে ভালোবাসেন। বোখারী, মুসলিম।

হজরত আনাস বর্ণনা করেছেন, একবার এক লোক রসুল স. এর সুমহান সন্নিধানে উপস্থিত হয়ে বললো, সুরাটি আমার খুব ভালো লাগে। তিনি স. বললেন, এই ভালো লাগাই তোমাকে নিয়ে যাবে জান্নাতে। তিরমিজি। বোখারীও এর সমার্থক হাদিস বর্ণনা করেছেন।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেছেন, রসুল স. একবার এক ব্যক্তিকে সুরা ইখলাস পাঠ করতে শুনে বললেন, অপরিহার্য হয়ে গেলো। আমরা সবিনয়ে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! কী অপরিহার্য হয়ে গেলো? তিনি স. বললেন, জান্নাত। মালেক, তিরমিজি, নাসাঈ। হজরত আনাস থেকে তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত এবং উত্তম ও বিরল শ্রেণীর আখ্যায়িত এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি শয়নকালে ডান কাতে শুয়ে একশত বার সুরা ইখলাস পাঠ করবে, মহাবিচারের দিবসে আল্লাহ্‌ তাকে বলবেন, হে আমার বান্দা! ডান দিক দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করো। তিরমিজি ও দারেমী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি দৈনিক একশতবার সুরা ইখলাস পাঠ করবে, আল্লাহ্‌পাক ক্ষমা করে দিবেন তার পঞ্চাশ বছরের পাপ। তবে তার ঋণের বোঝার ব্যাপারটি স্বতন্ত্র। অপর এক বর্ণনাতেও পঞ্চাশ বছরের পাপ মাফ করার কথা বলা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেখানে ঋণের উল্লেখ নেই। হজরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব থেকে অপরিণত সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রসুল স. একবার বললেন, যে ব্যক্তি এগারো বার 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' পাঠ করবে, তার জন্য বেহেশতে নির্মাণ করা হবে একটি গৃহ। আর কুড়িবার পাঠ করলে সেখানে নির্মিত হবে দু'টি প্রাসাদ। একথা শুনে হজরত ওমর নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র প্রিয়তম প্রত্যাদেশবাহক! তা হলে তো আমাদের জন্য বেহেশতে প্রাসাদ নির্মিত হবে অনেক। তিনি স. বললেন, আল্লাহ্‌র দান এর চেয়েও অধিক সুপ্রশস্ত। আল্লাহ্‌ই অধিক জ্ঞাত।

কলেমা তওহীদ

খাস মোজাদ্দেদিয়া তরিকার জরুরী অজিফার মধ্যে কলেমা তওহীদও একটি জরুরী অজিফা। 'দায়রায়ে মা'ইয়াত' মাকামে ছবক দেওয়ার পর অন্যান্য আমলের সঙ্গে এই কলেমার জিকির করতে বলা হয় প্রতিদিন কম পক্ষে ১০০ বার।

এক হাদিসে বর্ণনা করা হয়েছে, যখন তোমরা ফরজ নামাজ আদায় করো, তখন দশবার এই দোয়াটি পড়ো— 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন্‌ ক্বদীর'। এর সওয়াব এরকম— যেনো কেউ একটি গোলাম আজাদ করলো।

হজরত আবু হোরায়রা রা. বর্ণনা করেছেন, নবীয়ে রহমত স. এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাজের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ্‌, ৩৩ বার আলহামদু লিল্লাহ্‌, ৩৩ বার আল্লাহু আকবর এবং ১ বার এই দোয়া পড়বে, তার গোনাহ্‌ সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হলেও তা মাফ হয়ে যাবে— 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শরীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুয়া আ'লা কুল্লি শাইইন্‌ ক্বদীর'। মেশকাত, মুসলিম।

এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রসুলে আক্‌দাস স. এর ফুফাতো বোনগণ বলেন, আমরা দুই বোন এবং নবীনন্দিনী ফাতেমা একবার দরবারে নববীতে উপস্থিত হয়ে খাদেম চাইলাম। তিনি স. বললেন, বদর যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছে, তাদের এতিম সন্তানেরা খাদেম পাওয়ার ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে অধিক হকদার। আমি খাদেম অপেক্ষা উত্তম আমলের কথা বলে দিচ্ছি। তোমরা প্রত্যেক নামাজের পর সুবহানাল্লাহ্‌, আলহামদু লিল্লাহ্‌ এবং আল্লাহু আকবর এই তিনটি কলেমা ৩৩ বার করে পড়ো, আর একবার পড়ে নিও এই কলেমা— লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শরীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুয়া আ'লা কুল্লি শাইইন্‌ ক্বদীর।

তসবীহ্‌, তাহ্‌মীদ, তাহ্‌লিল, তক্‌বির

তসবীহ্‌ অর্থ 'সুবহানাল্লাহ্‌'। তাহ্‌মীদ অর্থ 'আলহামদু লিল্লাহ্‌'। তাহ্‌লীল অর্থ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌'। আর তক্‌বির অর্থ 'আল্লাহু আকবর'। হাদিস শরীফে এই কলেমাগুলির অনেক ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। এই কলেমাগুলি 'তসবী ফাতেমী' নামেও প্রসিদ্ধ। রসুলে আক্‌দাস স. এই কলেমাগুলি তাঁর প্রিয়তমা কন্যা হজরত ফাতেমাতুয্‌ যাহরাকে শিক্ষা দিয়েছেন।

হজরত আলী রা. তাঁর এক শিষ্যকে একবার বললেন, আমি তোমাকে আমার, আমার স্ত্রীর এবং রসুলুল্লাহ্‌র একটি ঘটনা শোনাবো কি? শিষ্য বললেন, অবশ্যই। হজরত আলী রা. বললেন, ফাতেমা নিজ হাতে যাঁতা চালাতেন। এর ফলে তাঁর হাতে কড়া পড়ে গিয়েছিলো। নিজেই মশক ভর্তি করে পানি বহন করে আনতেন। ফলে বুকের উপর রশির দাগ পড়ে গিয়েছিলো। নিজ হাতে ঘর ঝাড়ু দিতেন। তাই তার পরিধেয় বস্ত্র অপরিচ্ছন্ন হয়ে থাকতো। একবার রসুলুল্লাহ্‌র পবিত্র দরবারে এলো কিছুসংখ্যক ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী। আমি ফাতেমাকে বললাম, তুমি তোমার পিতার কাছ থেকে একজনকে চেয়ে আনতে যদি, তবে ভালো হতো। তোমার কষ্ট অনেকটা লাঘব হতো। তিনি আমার কথা মতো দরবারে নববীতে গমন করলেন। কিন্তু সেখানে লোকজনের ভীড় দেখে ফিরে এলেন। পরদিন রসুলুল্লাহ্‌ নিজেই এলেন। বললেন, ফাতেমা! তুমি কাল কী জন্যে গিয়েছিলে? ফাতেমা লজ্জায় কিছু বলতে পারলেন না। শেষে আমিই বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল! ফাতেমাকে যাঁতা পিষতে হয়। পানি বহন করে আনতে হয়। ঘর ঝাড়ু দিতে হয়। এসব করতে গিয়ে তার হাতে, বুকে দাগ পড়ে গিয়েছে। গতকাল ও গিয়েছিলো একজন খাদেম পাবার আশায়। আমিই যেতে বলেছিলাম। রসুলুল্লাহ্‌ স. বললেন, ফাতেমা! আল্লাহ্‌কে ভয় করো। ফরজ আদায় করতে থাকো। ঘরের কাজকর্মও করে যাও। আর রাতে শয্যাগ্রহণের প্রাক্কালে সুবহানাল্লাহ্‌ ৩৩ বার, আলহামদু লিল্লাহ্‌ ৩৩ বার এবং ৩৪ বার আল্লাহু আক্‌বার পড়ে নিও। এই আমল খাদেম অপেক্ষা উত্তম। একথা শুনে ফাতেমা বললেন, আমি আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রসুলের উপর সন্তুষ্ট। আবু দাউদ।

উল্লেখ্য, রসুলে আকদাস স. তাঁর পরিবারবর্গকে এবং আত্মীয়-স্বজনকে বিশেষভাবে এ সকল কলেমা পড়ার জন্য বলতেন। এক হাদিসে আছে, রসুলে আক্‌দাস স. তাঁর সহধর্মিণীগণকে শয়নের প্রাক্কালে 'সুবহানাল্লাহ্‌, আলহামদুলিল্লাহ্‌ এবং আল্লাহু আক্‌বার' ৩৩ বার করে পড়তে বলতেন। আর এক হাদিসে আছে, কোথাও আগুন লাগতে দেখলে বেশী বেশী করে 'আল্লাহু আক্‌বার' পড়তে থাকো। আল্লাহু আক্‌বার ধ্বনি আগুনকে নিভিয়ে দেয়।

হিসনে হাসীন গ্রন্থে আছে, কাজেকর্মে ক্লান্তি অনুভব করলে কিংবা শক্তি পেতে চাইলে রাতে শয্যাগ্রহণের আগে পড়তে হবে সুবহানাল্লাহ্‌ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ্‌ ৩৩ বার এবং আল্লাহু আক্‌বার ৩৪ বার ।

রসুলে আকরম স. এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্‌র নবী নূহ তাঁর এক পুত্রকে একবার বললেন, তোমাকে আমি এই মর্মে নসিহত করছি— দু'টি কাজ অবশ্যই কোরো, আর দু'টি কাজ অবশ্যই পরিত্যাগ কোরো। করণীয় কাজ দু'টি আল্লাহ্‌র

নিকট প্রিয়— একটি হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। যদি সকল আকাশ ও পৃথিবী মিলে একটি গোলাকার বৃত্ত হয়ে যায়, তবুও এই পাক কলেমা সেই বৃত্তকে অতিক্রম করে যাবে। যদি আকাশসমূহ ও পৃথিবী এক পাল্লায় রাখা হয়, আর অপর পাল্লায় রাখা হয় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্', তবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্র পাল্লাই হবে অধিক ভারী। করণীয় অপর কাজটি হচ্ছে 'সুব্হানাল্লাহি ওয়া বিহাম্দিহি' পড়া। এই কলেমা সমস্ত মাখলুকের ইবাদত। এর বরকতেই সকল সৃষ্টিকে রিজিক দেওয়া হয়। এমন কোনো সৃষ্টি নেই, যে আল্লাহ্র তসবীহ্ পড়ে না। আর যে দুটি কাজ বাদ দিতে বলেছি, সে দু'টি হচ্ছে শিরিক ও অহংকার। এই দুই কাজের কারণে আল্লাহ্ এবং বান্দার মধ্যে পর্দা পড়ে যায়। পর্দা পড়ে যায় আল্লাহ্র পুণ্যবান বান্দাদের সঙ্গেও। তারগীব, নাসাঈ।

হজরত আবু হোরায়রা রা. কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসুলে আক্দাস স. বলেছেন, দুটি কলেমা এমন, যা রসনার জন্য হাল্কা, ওজনে ভারী, আর আল্লাহ্র কাছে অত্যন্ত প্রিয়— 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আ'জীম'। বোখারী, মুসলিম।

এক হাদিসে আছে, রসুলে আকদাস স. বলেন, তোমাদের কেউ যেনো দৈনিক এক হাজার নেকি অর্জন করার বিষয়টিকে ছেড়ে না দেয়— 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' একশত বার পড়লে হাজার নেকি পাওয়া যায়। আর এক হাদিসে এসেছে, যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যা এক শত বার 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' পড়বে, তার গোনাহ্ সমুদ্রের ফেনা থেকে বেশী হলেও তা মাফ হয়ে যাবে। অন্য আর এক হাদিসে এসেছে, 'সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর' পড়লে এমনভাবে গোনাহ্ ঝ'রে যায়, যেমন (শীতকালে) ঝ'রে যায় বৃক্ষপত্র।

হজরত আবু যর গিফারী রা. বর্ণনা করেছেন, একবার আল্লাহ্র রসুল স. আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে বলবো, আল্লাহ্র কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয় কালাম কোনটি? আমি নিবেদন করলাম, নিশ্চয়ই। তিনি স. বললেন, 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী'। এক হাদিসে এরকমও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্তায়ালা ফেরেশতাদের জন্য যা পছন্দ করেছেন, তা-ই সর্বোত্তম— 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী'। মুসলিম, নাসাঈ।

মকতুবাত শরীফের বিবরণ

'বিসমিল্লাহির্ রহ্মানির রহীম। হামদ ও সালাতের পর, জানা আবশ্যক যে, আবেদ বা উপসনাকারী তার ইবাদতের সময় ইবাদতের মধ্যে যে সকল পূর্ণতা ও

সৌন্দর্যাদি প্রাপ্ত হয়, তা সবই আল্লাহ্তায়ালা কর্তৃক প্রদত্ত তওফীক ও এহ্সান (সামর্থ্য ও সৌন্দর্য)। পক্ষান্তরে যে সকল ত্রুটি ও অপূর্ণতা দৃষ্ট হয়, সেগুলোর সবই ইবাদতকারীর বিষয়, যা তার জন্মগত অপকর্ষ থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকে। আল্লাহ্তায়ালার পবিত্র জাতের প্রতি ওই ত্রুটিসমূহের কিছুই প্রবর্তিত হয় না, সেখানে সবই উৎকর্ষ ও পূর্ণতা মাত্র। এরূপ– নিখিল বিশ্বে যে সকল সৌন্দর্য ও পূর্ণতা সংঘটিত হয়, সেগুলোর সবই আল্লাহ্তায়ালার দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং যে সকল ক্ষয়-ক্ষতি সংঘটিত হয়, সে সকল সৃষ্ট বস্তুসমূহের প্রতি পরিচালিত হয়; যেহেতু সৃষ্ট বস্তুসমুদয় নাস্তির প্রতিই প্রতিষ্ঠিত আছে। আর নাস্তি থেকেই উদ্ভব হয় সকল ক্ষয়ক্ষতির। পবিত্র কলেমা 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' বিশদরূপে উক্ত বিষয় দুটির বর্ণনা করেছে যে, উল্লেখিত অপকর্ষ, ত্রুটি ইত্যাদি আল্লাহ্পাকের দরবারের উপযোগী নয়। অর্থাৎ তিনি সকল অপকর্ষ, ক্ষয়-ক্ষতি ও ত্রুটি থেকে পবিত্র (সুবহানাল্লাহ্)। হামদ বা প্রশংসা (আলহামদু লিল্লাহ্) যা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের শ্রেষ্ঠ বাক্য, তদ্দ্বারা আল্লাহ্পাকের সৌন্দর্যময় গুণ ও কর্মসমূহের (সিফাত ও আফয়ালের) নেয়ামত ও উপকারসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। একারণেই হাদিস শরীফে এসেছে, দিনে বা রাতে যদি কেউ এই কলেমা ১০০ বার পড়ে, তবে এই কলেমা ব্যতীত অন্য এমন কোনো আমল থাকে না যে, তা তার এই আমলের সমকক্ষ হয়। কীভাবে হবে? প্রত্যেক আমল এবং ইবাদত দ্বারা যে শোকর গোজারী (কৃতজ্ঞতা) প্রতিপালিত হয়, তা উল্লেখিত বাক্যের এক অংশের (আলহামদু লিল্লাহ্) দ্বারাই আদায় হয়ে যায়। অপর অংশ (সুবহানাল্লাহ্) থাকে অতিরিক্ত ও পৃথক একটি আমল। অতএব প্রত্যেকের কর্তব্য যে, দিনে ও রাতে ১০০ বার করে যেনো এই কলেমা পাঠ করা হয়। আল্লাহ্পাক তওফীক ও সুযোগ দান করুন। মকতুব নং ৩০৭, প্রথম খণ্ড।

'আল্লাহ্তায়ালা আপনাকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। জানবেন যে, রসুলুল্লাহ্ স. এরশাদ করেছেন, দু'টি বাক্য রসনার প্রতি অতি লঘু, কিন্তু মীযান বা পাল্লায় অতি গুরু, রহমানের নিকট অতি প্রিয়। 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আ'জীম (আমি আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর প্রশংসার সঙ্গে। আরও ঘোষণা দিচ্ছি আল্লাহ্র পবিত্রতার, যিনি অতীব মহান)। রসনার প্রতি লঘুত্বের অর্থ এই কলেমায় রয়েছে অল্প কয়েকটি অক্ষর। আর পরকালের পাল্লায় অতি গুরু ও আল্লাহ্র নিকট অতি প্রিয় হওয়ার কারণ— এই বাক্যের প্রথম অংশটি আল্লাহ্পাকের দরবারের পবিত্রতা ও নির্মলতা বর্ণনা করছে এবং প্রমাণ করছে যে, তাঁর সুউচ্চ দরবার ক্ষয়-ক্ষতি এবং নতুনত্বের অসৎ গুণাবলী থেকে বহু উচ্চে। দ্বিতীয় অংশটি আল্লাহ্তায়ালার পূর্ণতাগুণ এবং সৌন্দর্যময় শান বা মহিমা মহত্ত্বের

অবস্থিতি প্রমাণ করছে। সেগুলো উৎকর্ষ থেকে হোক কিংবা হোক অতিরিক্ত কিছু থেকে। উক্ত বাক্যের উভয় অংশ একত্রে প্রমাণ করছে আল্লাহ্পাকের জন্য সমূহ পবিত্রতা-বিশুদ্ধতা এবং সমুদয় সৌন্দর্য-পূর্ণতা। অতএব প্রথম অংশটির মর্ম এই যে, সমস্ত পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা কেবলই আল্লাহ্তায়ালার এবং যাবতীয় পূর্ণতা ও সৌন্দর্যও কেবলই তাঁর। দ্বিতীয় অংশে প্রমাণিত হচ্ছে— সমূহ বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা কেবল তাঁর জন্য তো বটেই, উপরন্তু মহত্ত্ব ও উচ্চতাও কেবলই তাঁর। এই বাক্যটির মধ্যে এই ইঙ্গিতটিও রয়েছে যে, অতুলনীয় পবিত্রতা ও উচ্চতার কারণেই সমুদয় ক্ষয়-ক্ষতি তাঁর সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত। সুতরাং বাক্যদ্বয় মীযানের পাল্লায় অতীব গুরু এবং আল্লাহ্র নিকট প্রিয়। আরো বলা যায় যে, 'তসবীহ' পাঠ তওবা বা ক্ষমাপ্রার্থনার কুঞ্জি স্বরূপ; বরং তার সারাংশতুল্য। কতিপয় মকতুবে আমি একথার প্রমাণও দিয়েছি। অতএব তসবীহ পাঠ (কলেমা পাঠ) পাপ বিমোচন ও ক্ষমাপ্রাপ্তির অবলম্বন। কাজেই এই কলেমা মীযানে ভারী হবে এবং গুরুত্ব বর্ধন করবে পুণ্যের পাল্লার। রহমানের নিকটেও হবে অধিকতর প্রিয়। কেননা আল্লাহ্ ক্ষমা করতে ভালোবাসেন। আরো বলা যেতে পারে 'হাল জাযাউল ইহ্সানি ইল্লাল ইহ্সান' (উপকারের পরিবর্তে কি উপকার নয়)। সুরা আর্রহমান। আয়াত ৬০। এই আয়াত অনুসারে যখন তসবীহ পাঠকারী আল্লাহ্তায়ালাকে যাবতীয় অনুপযুক্ততা থেকে পবিত্র প্রমাণ করে এবং পূর্ণতা ও সৌন্দর্যগুণসমূহ তাঁরই প্রতি প্রবর্তিত করে, তখন দাতা দয়ালু আল্লাহ্ পাকের দরবার থেকে এমতো আশা করা যায় যে, তিনি তসবীহ পাঠকারীকে তার জন্য যা অনুপযুক্ত ও নিন্দনীয়, তা থেকে পবিত্র করে দেন এবং প্রশংসনীয় পূর্ণতা গুণসমূহ তাকে দান করেন। সুতরাং এই বাক্য পাপ বিমোচনকারী হিসাবে মীযানের মধ্যে গুরুতর হবে এবং প্রশংসনীয় গুণ হিসাবে রহমানের নিকটে হবে প্রিয়তর। মকতুব নং ৩০৮। প্রথম খণ্ড।

'হামদ সালাত ও দোওয়ার পর জানিবেন যে, মাশায়েখে কেরামের মধ্যে একদল মাশায়েখ হিসাব রাখার পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন। প্রতি রাতে নিদ্রার পূর্বে তাঁরা নিজেদের কথাবার্তা, কার্যকলাপ ও গতিবিধির গবেষণা করে থাকেন এবং বিস্তারিতভাবে প্রত্যেকটির তত্ত্বে উপনীত হন এবং তওবা ইস্তেগফার, কাঁদাকাটি, অনুনয়-বিনয় দ্বারা পাপ-ত্রুটিসমূহের ক্ষতিপূরণ করে থাকেন। সৎকাজসমূহ আল্লাহ্তায়ালার সাহায্যে সংঘটিত হচ্ছে বলে তাঁরা তাঁর শোকর গোজারী ও কৃতজ্ঞতা পালন করেন। 'ফতুহাতে মক্কিয়া' নামক পুস্তকের প্রণেতা উক্ত হিসাব পালনকারীগণের একজন ছিলেন। তিনি বলতেন, 'আমি হিসাবের (মোহাসাবার) সময় অন্যান্য মাশায়েখের চেয়ে অতিরিক্ত করতাম। নিজের দুশ্চিন্তা ও নিয়ত বা

উদ্দেশ্যসমূহকেও গণনা করতাম। এই ফকিরের নিকট প্রতিদিন নিদ্রার পূর্বে সুবহানাল্লাহ্, আলহামদু লিল্লাহ্ এবং আল্লাহু আকবর শতবার করে পাঠ করা, যে রকম নবীয়ে করিম স. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তা উল্লেখিত হিসাব পালন তুল্য হয়। তসবীহ পাঠ, যা তওবা-ইস্তেগফারের কুঞ্জি স্বরূপ, তদ্দ্বারা নিজের দোষ-ত্রুটিসমূহের ক্ষমা হয়ে থাকে এবং উক্ত দোষত্রুটির কারণে আল্লাহ্তায়ালার পাক দরবারে যা কিছু সংঘটিত হয়েছিলো, তা থেকে তাকে বিশুদ্ধ করে। কেননা পাপ সংঘটক যদি আল্লাহ্তায়ালার উচ্চতা ও মহত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখতো, তবে নিশ্চয় তাঁর আদেশ নিষেধ অমান্য করতো না। অমান্য যখন করলোই, তখন বুঝা গেলো তার কাছে আল্লাহ্তায়ালার আদেশ নিষেধের কোনো মূল্যই নেই। এরূপ বিশ্বাস থেকে আল্লাহ্পাক আমাদেরকে রক্ষা করুন। অতএব উক্ত কলেমার পুনরাবৃত্তি উল্লেখিত পাপ ত্রুটিসমূহের ক্ষতিপূরণ করে দেয়।

জানা আবশ্যক যে, ইস্তেগফার বা ক্ষমাপ্রার্থনা দ্বারা পাপরাশি গোপন রাখার প্রার্থনা জানানো হয় এবং এই পবিত্র কলেমা দ্বারা পাপরাশি সমূলে উৎপাটন করার প্রার্থনা করা হয়। অতএব উভয়ের পার্থক্য অনুধাবন করা উচিত। 'সুবহানাল্লাহ্! এটি একটি বিস্ময়কর বাক্য। এর অক্ষরসমূহ অতি অল্প এবং গুণ ও উপকারিতা অত্যধিক।

প্রশংসার বাক্য, অর্থাৎ আলহামদু লিল্লাহ্ পুনরাবৃত্তি করা আল্লাহ্তায়ালার সুযোগ ও শক্তি প্রদানের শোকর গোজারী প্রকাশ ও প্রতিপালন করে। 'কলেমায়ে তক্বীর' (আল্লাহু আক্বর) ইঙ্গিত করছে যে, আল্লাহ্পাকের পবিত্র দরবার অতি উচ্চ। উক্তরূপ ক্ষমাপ্রার্থনা ও কৃতজ্ঞতা পালন তাঁর দরবারের উপযোগী নয়। যেহেতু বান্দার ক্ষমাপ্রার্থনাও বহু ক্ষমাপ্রার্থনার মুখাপেক্ষী এবং তাঁর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করে। 'উহারা যাহা আরোপ করে তাহা হইতে পবিত্র ও মহান তোমার প্রতিপালক, যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী। শান্তি বর্ষিত হউক রসূলদের প্রতি! আর সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্রই প্রাপ্য'। সূরা সাফ্ফাত, আয়াত ১৮০-১৮২। দৈনিক হিসাব রক্ষাকারীগণ ইস্তেগফার ও শোকরগোজারী করাকেই যথেষ্ট মনে করেন। কিন্তু উল্লেখিত কলেমাসমূহ দ্বারা ইস্তেগফারের কাজও হয় এবং কৃতজ্ঞতা পালনও হয় এবং উক্ত ইস্তেগফার ও কৃতজ্ঞতার মধ্যে যে সকল ত্রুটি আছে, তার স্বীকৃতিও লাভ হয়। হে আল্লাহ্! আমাদের আমলসমূহ গ্রহণ করো। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রুতিধর ও সর্বজ্ঞ। আল্লাহ্তায়ালা আমাদের মহান নবী মোহাম্মদ স. ও তাঁর পবিত্র বংশধরগণের প্রতি দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন। আমিন। মকতুব নং ৩০৯, প্রথম খণ্ড।'

আয়াতুল কুরসি

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ -

(আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। তাঁহাকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সমস্ত তাঁহারই। কে সে, যে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত তাঁহার নিকট সুপারিশ করিবে? তাহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা কিছু আছে, তাহা তিনি অবগত। যাহা তিনি ইচ্ছা করেন, তদ্ব্যতীত তাঁহার জ্ঞানের কিছুই তাহারা আয়ত্ত করিতে পারে না। তাঁহার 'কুরসী' আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত; ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁহাকে ক্লান্ত করে না; আর তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ)। সুরা বাকারা, আয়াত ২৫৫।

ব্যাখ্যাঃ 'আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল ক্বইয়ূম' (আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব)। একথার অর্থ আল্লাহ্ই একমাত্র উপাসনার উপযুক্ত। তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদত গ্রহণ করতে পারে না। তাঁর জ্ঞান, শ্রুতি, অলৌকিকত্ব, অভিপ্রায়— সকল গুণাবলী তাঁরই সত্তানির্ভর। তিনি সর্বময় শুভবৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। সদা বিদ্যমান। সদা বিদ্যমান ছিলেন। সদা বিদ্যমান আছেন এবং সদাবিদ্যমান থাকবেন। স্থান, কাল, পাত্রের ক্ষতি তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তাঁর অমরতাই তাঁর গুণাবলীকে পূর্ণ করেছে।

'ক্বইয়্যুম' (চিরঞ্জীব) অর্থ নিজ সত্তায় বিদ্যমান থাকা এবং অন্যকে বিদ্যমান রাখা। আমর ইবনে মাসউদ উচ্চারণ করতেন 'আল ক্বিইয়্যামু'। আল কামার পড়তেন 'আল ক্বইয়্যিমু'। ইমাম বাগবী লিখেছেন, এগুলোর অর্থ একই। 'ক্বিইয়্যামু' অর্থ দৃষ্টিদানকারী। এরকম বলেছেন ইবনে মুজাহিদ। অথবা সমস্ত কিছুর আমলের হেফাজতকারী। এরকম বলেছেন কালবী। 'ক্বইয়্যুম' এর অর্থ ওই

সমস্ত কার্যাবলী, যা শৃঙ্খলার সাথে সম্পাদিত হয়। হজরত আবু ওবায়দা বলেছেন, ক্বইয়্যুম অর্থ যার ধ্বংস নেই। বায়যাবী লিখেছেন, 'ক্বইয়্যুম' এর অর্থ যা সব সময় সৃষ্টিকে সুসঙ্গতরূপে রক্ষা করে। আল্লামা সুয়ূতী বলেছেন, যা সব সময় স্থায়ী থাকবে। আমি বলি, এ সকল কথার সম্মিলিত অর্থ এরকম— আল্লাহ্ ধ্বংসশীল নন। তিনি তাঁরই অস্তিত্বনির্ভর, স্বাধিষ্ঠ— স্ব সত্তায় সতত অধিষ্ঠিত। তিনি সকল কিছুর সংরক্ষণকারী। অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব দানকারী। তিনি ব্যতীত কেউ স্থায়ী থাকবে না। সৃষ্টি তাঁর অস্তিত্ব ও স্থায়ীত্বের জন্য তাঁরই মুখাপেক্ষী। কিন্তু তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। প্রত্যেকের ছায়া যেমন মূল বস্তুর মুখাপেক্ষী, তার চেয়ে বেশী মুখাপেক্ষী সৃষ্টি তাঁর প্রতি।

'লা তা'খুজুহু সিনাতুঁউ ওয়ালা নাঊম' (তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না)। তন্দ্রা হচ্ছে নিদ্রার প্রাথমিক প্রভাব, যা মস্তিষ্ককে অসাড় করে দেয়। আর নিদ্রা ওই অক্ষম অবস্থা, যখন অনুভূতি হয় অপসৃত।

হজরত আবু মুসা আশয়ারী রা. বলেন, রসুলুল্লাহ্ স. একদিন আমাদের সম্মুখে পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ করলেন— আল্লাহ্ শয়ন করেন না। শয়ন করা তাঁর মর্যাদার উপযুক্ত নয়। তিনি মীযানকে উঁচু নীচু করান। রাতের পূর্বে দিনের এবং দিনের পূর্বে রাতের কার্যাবলী তাঁর সমীপে উপস্থিত করা হয়। তাঁর নূর পর্দা আবরিত। পর্দা উঠে গেলে তাঁর সৌন্দর্যরাজি দৃষ্টিকে বিপন্ন করবে। মুসলিম। 'লাহু মা ফিস্ সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ্ব' (আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তাঁর) এই কথাটি আল্লাহ্পাকের সার্বভৌম এককত্বের প্রমাণ। তিনিই এসকল কিছুকে কায়েম রেখেছেন। আকাশ ও পৃথিবী বিদ্যমান রয়েছে আল্লাহ্তায়ালার জন্যই। আর তিনি স্বয়ং বিদ্যমানতা।

'মান জাল্লাজী ইয়াশ্ফাউ' ইনদাহু ইল্লা বিইজনিহ্' (কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে)— এখানে আল্লাহ্পাক তাঁর সত্তার অতুলনীয় পরাক্রম প্রকাশ করেছেন। স্পষ্টতই বলে দিয়েছেন, তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁর দরবারে কেউ তার আবেদন-নিবেদনও প্রকাশ করতে পারে না।

'ইয়া'লামু মা বাইনা আইদীহিম ওয়ামা খল্ফাহুম' (তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে, তা তিনি অবগত)— অর্থাৎ তিনি সকলের ও সকল কিছুর অগ্র-পশ্চাৎ, অতীত-ভবিষ্যত, প্রকাশ্য-গোপন, সংক্ষিপ্তি-বিস্তৃতি— সবকিছুই জানেন। মানুষের জ্ঞান এরকম নয়। তাদের কাছে কিছু বিষয় গোপন এবং কিছু বিষয় প্রকাশ্য, কিছু জ্ঞাত, অধিকাংশই অজ্ঞাত। আর আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালার জ্ঞান সকল কিছুকে বেষ্টন করে আছে। সকল কিছু অর্থ আকাশ ও পৃথিবীর সকল কিছু। জ্ঞানী ও অজ্ঞ সবাই এর অন্তর্ভূত। জ্ঞানীগণের মধ্যে শামিল রয়েছেন নবী ও ফেরেশতাগণ।

'ওয়ালা ইউহিতূনা বি শাইইম্ মিন্ ইল্মিহী ইল্লা বিমাশা-আ (যা তিনি ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না)। একথার অর্থ কোনো জ্ঞানই তাঁকে বেষ্টন করতে পারে না। সর্বপরিব্যপ্ত ও সর্বপরিবেষ্টিত জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র। কামেল ব্যক্তিগণের জ্ঞান এরকম নয়। এখানে জ্ঞান বলতে ইলমে গায়েবকে বোঝানো হয়েছে, যা কেবল আল্লাহ্‌পাকের জন্যই বিশিষ্ট। এখানে কারো কোনো অংশ নেই। তবে হ্যাঁ আল্লাহ্‌পাক যাকে যতটুকু জ্ঞান দান করতে চান, সে ততটুকুই পায়। এক আয়াতে আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন

وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلً -

(এবং তোমাদিগকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে সামান্যই)। সুরা বানী ইস্‌রাইল, আয়াত ৮৫।

'ওয়াসিয়া কুরসিউয়্যুহুস্ সামাওয়াতি ওয়াল্ আরদ্ব' (তাঁর আসন আকাশ ও পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত)— ইমাম বায়যাবী লিখেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতাপ-পরাক্রম প্রকাশ করাই এই বাক্যটির উদ্দেশ্য। অন্যথায় তাঁর আসনও নেই এবং তিনি আসনে উপবেশনকারীও নন। সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেছেন, হজরত ইবনে আব্বাসের মতে আসন হচ্ছে— এলেম (জ্ঞান)। মুজাহিদের মতও তাই। কিছুসংখ্যক আলেম 'আসন' শব্দটির অর্থ করেছেন আল্লাহ্‌পাকের অলৌকিক রাজত্ব। আমি বলি 'কুরসি' অর্থ এলেম ও অলৌকিকত্ব দুটোই। এই আয়াতের প্রথম অংশে আল্লাহ্‌তায়ালার অলৌকিকত্ব এবং শেষাংশে জ্ঞানের পরিপূর্ণতা প্রকাশ পেয়েছে। মুহাদ্দিসগণের সুবিখ্যাত বর্ণনা হলো— কুরসি দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতাবিশিষ্ট।

হজরত আবু হোরায়রা রা. বলেছেন, 'কুরসী' হচ্ছে আরশের ছাদ, যা আকাশ ও পৃথিবীর সমান প্রশস্ত।

হজরত আবু হোরায়রা রা. থেকে ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন, রসুলে আকরম স. বলেছেন, সাত আকাশ ও সপ্তস্তরবিশিষ্ট জমিন কুরসির তুলনায় এরকম— যেমন প্রকাণ্ড প্রান্তরে পড়ে থাকা একটি আঙটি। আরশের তুলনায় কুরসিও তদ্রূপ।

হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, কুরসির নিকট সাত আসমান এরকম, যেনো ঢালের মধ্যে পড়ে থাকা সাতটি দিরহাম।

হজরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু এবং মুকাতিল বর্ণনা করেছেন, কুরসির প্রতিটি স্তম্ভ সপ্ত আকাশ ও সপ্তস্তর বিশিষ্ট পৃথিবীর সমান। কুরসি আছে আরশের সম্মুখভাগে। চারজন ফেরেশতা এর বাহক। তাদের প্রত্যেকের রয়েছে

চারটি করে মুখ। আর তাদের পা রয়েছে জমিনের নিচে পাথরের উপরে। এক ফেরেশতা থেকে আর এক ফেরেশতার ব্যবধান পাঁচশত বছরের পথের দূরত্বের সমান। একজনের চেহারা হজরত আদম আ. এর মতো। তিনি মানুষের রিজিকের জন্য দোয়া করতে থাকেন। দ্বিতীয় জনের চেহারা চতুষ্পদ প্রাণীর মতো অথবা গাভীর মতো। তিনি দোয়া করতে থাকেন চতুষ্পদ জন্তুর রিজিকের জন্য। যখন বাছুরের পূজা করা হয় তখন তার মুখমণ্ডল মলিন হয়ে যায়। তৃতীয় ফেরেশতার আকৃতি সিংহের মতো। হিংস্র পশুকুলের রিজিক প্রার্থনাই তার কাজ। চতুর্থ ফেরেশতার অবয়ব শকুনের মতো। পাখিদের রিজিক প্রার্থনাই তার দায়িত্ব। বিভিন্ন হাদিসে এসেছে, আরশ ও কুরসি বহনকারীদের মধ্যে সত্তরটি নূরের ও সত্তরটি অন্ধকারের পর্দা আছে। প্রতিটি পর্দা অবস্থিত পাঁচশত বৎসরের পথের দূরত্বে। পর্দাসমূহ না থাকলে আরশ বহনকারীদের নূরে কুরসি বহনকারীগণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। প্রকৃতপক্ষে কুরসি এমন স্থান, যেখানে উপবেশন করা যায়। প্রশস্ত স্থানকে কুরসি বলা যায় না। কিন্তু কুরসি ও আরশ আল্লাহ্তায়ালার জন্যই বিশিষ্ট। অন্য কারো জন্য শব্দ দুটি প্রযোজ্য হতে পারে না। অন্য একটি আয়াতের উল্লেখ এরকম—

ثُمَّ اسْتَوٰىٓ اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ -

(তৎপর তিনি আকাশের দিকে মনোসংযোগ করেন এবং উহাকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন)। সুরা বাকারা, আয়াত ২৯। এই বাক্যটির ব্যাখ্যায় আমরা লিখেছি, আরশ বৃত্তাকার। হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, কুরসি আকাশসমূহকে বেষ্টন করে আছে এবং কুরসিকে বেষ্টন করে আছে আরশ। আর এক আকাশকে বেষ্টন করে আছে অন্য আকাশ। প্রত্যেক আকাশ গোলাকার। এ কারণে বিভিন্ন জন বলেছেন, অষ্টম আকাশ কুরসি এবং নবম আকাশ আরশ। কিন্তু আল্লাহ্পাক আকাশের সংখ্যা নির্ধারণ করেছেন সাতটি। আরশ ও কুরসিকে তিনি আকাশ বলেননি। সম্ভবতঃ এর কারণ এই যে, আরশ-কুরসি এবং আকাশের হকিকত পৃথক। আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

'ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফজুহুমা' (এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না)— একথার অর্থ আকাশ-পৃথিবী-কুরসি এবং কুরসি যে সকল কিছুকে বেষ্টন করে আছে সে সকল কিছুর সংরক্ষণে তিনি ক্লান্ত কিংবা বিব্রত নন। তাঁর অপার জ্ঞান, পরাক্রম ও তাঁর চিরস্থায়ীত্বের কথা প্রমাণিত হয়েছে এই আয়াতে।

হজরত আবু যর রা. হজরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, কুরসির বেষ্টন কোরআনের ব্যাখ্যা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। গবেষণা দ্বারা নয়। কুরসি হচ্ছে আল্লাহ্তায়ালার অসীম পরাক্রমের প্রকাশ। আকাশগুলো কুরসির

কাছে এতো ছোট যে, ঢালের মধ্যে সাতটি আঙটি, অথবা বিশাল প্রান্তরে পড়ে থাকা কোনো ক্ষুদ্র অঙ্গুরীয়। কুরসির বেষ্টন আকৃতিসম্ভূত, অলৌকিকতাচ্ছাদিত, জ্ঞানাবৃত, নাকি হুকুম ও ইচ্ছা-আবরিত— তা অনুমানসাপেক্ষ নয়। ইমানদারদের অন্তরসমূহ আল্লাহ্ রহমানের দুই আঙ্গুলের মাঝখানে— এ অবস্থাটিও তেমনি অননুমানীয়। যা সম্ভব নয়, দার্শনিকেরা তা-ই করতে চেষ্টা করেছে। তাই তারা ভ্রষ্ট। অতএব, এই ফকিরের দৃষ্টিতে প্রকৃত পথ এই যে, নিজেদের অভিমতানুসারে কোরআন মজীদ ও হাদিস শরীফের ব্যাখ্যাগুলোকে যেনো মেলানোর চেষ্টা করা না হয়। তবে হ্যাঁ, কোনো দার্শনিক যদি কোরআনের ব্যাখ্যায় নির্ভর করে, তবে তা দূষণীয় বলে বিবেচিত হবে না।

আয়াতের শেষদিকে বলা হয়েছে 'ওয়াহুয়াল আলিয়্যুল আ'জীম' (তিনিই মহান, শ্রেষ্ঠ)। শ্রেষ্ঠ ও মহান কেবল তিনিই। কেউ বা কোনোকিছু তাঁর সমকক্ষ নয়। মর্যাদার দিক থেকে যেমন নয়, তেমনি নয় গুণের দিক থেকেও। প্রশংসাকারীগণ তাঁর প্রশংসা করে। গুণ বর্ণনাকারীরা করে গুণকীর্তন। কিন্তু আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালা তাদের প্রশংসা ও গুণকীর্তন অপেক্ষা উচ্চ। তাঁর মর্যাদা শোভনীয় কেবল তাঁরই জন্য। সর্ববিষয়ে তিনি এমনই মহান, যা সৃষ্টির সঙ্গে কোনো অবস্থাতেই তুলনীয় নয়।

এই আয়াতে আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্বের (জাতের) বর্ণনা আছে। কিছু গুণাবলীরও (সিফাতের) বর্ণনা আছে। আছে হায়াত (জীবন) এর অনুসরণে এলেম, কুদরত, ইচ্ছা, শ্রবণশক্তি, দর্শনশক্তি এবং বাকশক্তি— এসব গুণাবলীর বর্ণনা। তিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেছেন। তাদেরকে রক্ষা করছেন। কিন্তু সৃষ্টি তাঁর সঙ্গী নয়। কোনো কোনো আলেম বলেছেন, পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহ্র দিকে মুখ করে আছে, কিন্তু তারা আল্লাহ্র সাথে মিলিত নয়। আল্লাহ্র সঙ্গে সৃষ্টির সঙ্গতা এবং মিলনের প্রকৃতি কী— তা আমরা অবগত নই। আল্লাহ্ আমাদের প্রাণরগ অপেক্ষা নিকটে। কিন্তু এই নৈকট্য আমাদের বোধবহির্ভূত। স্থান ও বস্তুর নৈকট্য থেকে তিনি পবিত্র। তাদের দুর্বলতা হতেও মুক্ত। তিনি সকলকিছুর মালিক। তিনি কঠিন হস্তে ধারণকারী, প্রতিশোধ গ্রহণে কঠোর। তাঁর অনুমোদন ব্যতিরেকে কারো কোনো সুপারিশও তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদিত হতে পারে না। তাঁর অসীম জ্ঞান আমাদেরকে আবৃত করে আছে। কোনো কিছুই তাঁর কুদরত ও হিকমত বহির্ভূত নয়। সতত নির্দেশদান তাঁর পক্ষে কঠিন ও কষ্টকর নয়। কারো ব্যাগ্রতা ও ব্যতিব্যস্ততা তাঁকে অমনোযোগী করতে অক্ষম। সকল অনুপযুক্ততা থেকে তিনি পুত-পবিত্র। সকল প্রশংসা অপেক্ষা উচ্চ।

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেরিত পুরুষ স. যাঁর হাতে মহাবিচারের দিবসে শোভা পাবে প্রশংসার পতাকা, তিনিও আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালার প্রশংসা বর্ণনা করতে তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। তিনি স. তাঁর প্রার্থনায় বলতেন, তুমি তেমনই, যেমন তুমি বলেছো। তোমার তুলনায় সবকিছু অত্যন্ত নিকৃষ্ট। তোমার মহিমা-মহত্ত্বের সম্যক ধারণা সৃষ্টি ধারণ করতে অক্ষম। তোমার উপযুক্ত উপাসনা সৃষ্টির পক্ষে সম্পাদন সম্ভব নয়।

তিনি স. বলেছেন, আমরা তাঁর ইচ্ছা অনুসারে ইবাদত করতে পারি না। যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহ্র রসুল! কোরআনের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আয়াত কোনটি? তিনি স. বললেন, আয়াতুল কুরসি। তারপর বলা হলো, সর্বাপেক্ষা সম্মানিত সুরা কোনটি? তিনি স. বললেন, সুরা ইখলাস। দারেমী।

হজরত উবাই ইবনে কা'ব বলেছেন, আবুল মুনজার একবার রসুলেপাক স. কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! সবচেয়ে সম্মানিত আয়াত কোনটি? তিনি স. বললেন, আয়াতুল কুরসি। তারপর তিনি স. তাঁর বুকে হাত রেখে দোয়া করলেন, তোমার বরকতপূর্ণ জ্ঞানার্জন হোক। তারপর বললেন, ওই জাত পাকের কসম, আমার জীবন যার হাতে, আল্লাহ্র আরশের পায়ের কাছে এক ফেরেশতা এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালার পবিত্রতা ঘোষণা করছে। আর আলমে মেসালেও ফেরেশতাগণ এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্পাকের প্রশংসা জ্ঞাপন করেন (জড় জগত ও রূহের জগতের প্রকাশিতব্য বিষয়সমূহ আলমে মেসালে বিদ্যমান)। ইবনে মারদুবিয়া, ইবনে মাসউদ এবং ইবনে রহ্ওয়াইহ্ তাঁদের সনদে হজরত আউফ বিন মালেক থেকে এরকম বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহ্মদ ও ইমাম মালেক বর্ণনা করেছেন হজরত আবু যর গিফারী রা. থেকে।

হজরত আবু হোরায়রা রা. থেকে সুপরিণত (মারফু) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রসুলে রহমত স. বলেছেন, আয়াতুল কুরসি কোরআনের আয়াতসমূহের সরদার। তিরমিজি, হাকেম।

হজরত আনাস রা. বলেন, আয়াতুল কুরসি সওয়াবের দিক দিয়ে কোরআনের এক চতুর্থাংশের সমান। আহ্মদ।

হজরত আবু হোরায়রা রা. বলেছেন, রসুলে আকরম স. এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আয়াতুল কুরসি এবং হা মীম তান্যিলুল কিতাবি মিনাল্লাহিল্ আযিযিল আ'লীম— এই আয়াত দু'টি দিনে পাঠ করে, সে সারা দিন আল্লাহ্র হেফাজতে থাকে। আর যে ব্যক্তি রাতে পাঠ করে, সে হেফাজতে থাকে সারা রাত। তিরমিজি, দারেমী।

হজরত আবু হোরায়রা রা. বর্ণনা করেছেন, রসুলুল্লাহ্ আমাকে জাকাতের মালের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। একবার রাতে এক লোক মাল চুরি করতে এলো। আমি তাকে ধরে ফেললাম। বললাম, তোমাকে আল্লাহ্‌র রসুলের কাছে নিয়ে যাবো। সে বললো, আমি ছেলেমেয়েদের কারণে এরকম করেছি। আমার দয়া হলো। তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে যখন রসুলুল্লাহ্‌র মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হলাম, তখন তিনি স. বললেন, আবু হোরায়রা! তোমার বন্দি কোথায়? আমি বললাম, সে তার ছেলেমেয়েদের দুঃখকষ্টের কথা বলেছিলো। তাই তাকে ছেড়ে দিয়েছি। তিনি স. বললেন, সাবধান! সে মিথ্যা বলেছে। সে আবার আসবে। রাতে সে আবার এলো। আমি তাকে ধরে ফেললাম। সে আগের মতো তার দুঃখ-দুর্দশার কথা জানালো। আমি আবারো তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে রসুলুল্লাহ্ স. একই কথা বললেন, যেমন বলেছিলেন আগে। সে কিন্তু তৃতীয়বারও চুরি করতে এলো। আমি বললাম, তুমি আর চুরি করবে না— এরকম কথা বলেছো দু'বার। এখন অবশ্যই আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র রসুলের দরবারে নিয়ে যাবো। সে বললো, আমি তোমাকে কয়েকটি বাক্য শেখাবো, যা তোমার উপকারে আসবে। শয্যাগ্রহণের সময় আয়াতুল কুরসি পড়ে নিয়ো। আল্লাহ্ তোমার জন্য হেফাজত নির্ধারণ করবেন। সকাল পর্যন্ত তোমার কাছে শয়তান আসতে পারবে না । একথা শুনে আমি তাকে মুক্তি দিলাম। সকালে আল্লাহ্‌র রসুলের পবিত্র সাহচর্যে উপস্থিত হতেই তিনি স. বললেন, রাতের কয়েদী কোথায়? আমি বললাম, সে আমাকে কয়েকটি বাক্যের কথা বলেছে। তিনি স. বললেন, সে মিথ্যুক। কিন্তু সে তোমাকে যা শিখিয়েছে, তা সত্য। তুমি কি জানো, লোকটি কে? আমি বললাম, না। তিনি স. বললেন, সে শয়তান। বোখারী, নাসাঈ, ইবনে হাব্বান।

রসুলে রহমত স. এরশাদ করেছেন, ফরজ নামাজের পর আয়াতুল কুরসি পাঠকারীর বেহেশতে প্রবেশের পূর্বে মৃত্যু ব্যতীত আর কোনো পর্দা নেই। অন্য বর্ণনায় আছে, শয্যাগ্রহণের সময় আয়াতুল কুরসি পাঠকারী এবং তার প্রতিবেশীগণ নিরাপদে থাকে। 'শো'বুল ইমান' পুস্তকে ইমাম বায়হাকী হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি ফরজ নামাজের পরে আয়াতুল কুরসি পড়ে, নামাজের সময় অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত সে হেফাজতে থাকে এবং তার প্রতি আল্লাহ্‌র রসুল স্বয়ং অথবা কোনো সিদ্দীক বা কোনো শহীদ খেয়াল রাখেন।

'মোজালেস' নামক পুস্তকে হজরত হাসান লিখেছেন, রসুলে রহমত স. বলেছেন, জিব্‌রাইল আমাকে বলেছে, শয়তান নারীরূপে তোমাদের কাছে ধোকা দিতে আসে। তাই শয্যায় গমনের সময় আয়াতুল কুরসি পড়ে নিয়ো।

‘ফেরদাউস’ পুস্তকে হজরত কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, অশান্তির সময় আয়াতুল কুরসি পড়লে আল্লাহ্‌র সাহায্য পাওয়া যায়।

হজরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, একবার আমার পিতা ওমর বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আছে এমন, যে বলে দিতে পারে, সবচেয়ে মর্যাদামণ্ডিত, সবচেয়ে অনুগ্রহজ্ঞাপক এবং ভীতিপ্রদ ও সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক আয়াত কোনটি? জবাব দিলেন ইবনে মাসউদ। বললেন, অত্যধিক মর্যাদাপূর্ণ আয়াত হচ্ছে-

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ -

(আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই. তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক)। সুরা বাকারা, আয়াত ২৫৫।

সবচেয়ে অনুগ্রহ্জ্ঞাপক আয়াত

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى -

(নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন)। সুরা নাহ্ল, আয়াত ৯০।

সবচেয়ে ভীতিপ্রদ আয়াত

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ - وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ -

(কেহ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করিলে সে তাহা দেখিবে এবং কেহ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করিলে সে তাহাও দেখিবে)। সুরা যিল্যাল, আয়াত ৭, ৮।

আর সর্বাধিক আশাপ্রদ আয়াতটি হচ্ছে—

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ

اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ۭ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ -

(বল, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যাহারা নিজেদের প্রতি অবিচার করিয়াছ— আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হইতে নিরাশ হইও না; আল্লাহ্ সমুদয় পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু)। সুরা যুমার, আয়াত ৫৩।

জ্ঞাতব্যঃ খাস্ মোজাদ্দেদিয়া তরিকার সালেকবৃন্দকে এক বিশেষ নিয়মে আয়াতুল কুরসি পড়তে বলা হয়। নিয়মটি এই— রাতে অথবা দিনে, অথবা শুধু রাতে এক বৈঠকে ৭ বার আয়াতুল কুরসি পড়তে হবে। প্রথম বার পড়ে সামনে, দ্বিতীয় বার পড়ে পিছনে, তৃতীয়বার পড়ে ডানে, চতুর্থবার পড়ে বামে, পঞ্চমবার পড়ে উপরে, ষষ্ঠবার পড়ে নিচের দিকে এবং সপ্তমবার পড়ে দুই হাতের তালূতে ফুঁ দিয়ে সমস্ত শরীর মুছে ফেলতে হবে।

আমি তোমারই প্রশংসা-প্রশস্তি, স্তব-স্তুতি, মহিমা-মহত্ত্ব ও উচ্চতা-পবিত্রতা বর্ণনা করি হে আমার পরম প্রিয়তম প্রভুপালনকর্তা! তুমি ছাড়া উপাস্য কেউই নেই। আমি আমার সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে মান্য করি তোমার প্রতাপ-পরাক্রমকে। তুমি স্বাধিষ্ঠ, স্বতিষ্ঠ, স্বয়ম্ভু। আমি চাই তোমার দয়া, ক্ষমা ও সাহায্য। আমি সাক্ষ্য দেই, তুমিই আকাশ-পৃথিবীসহ সকলের ও সকল কিছুর একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধীশ্বর। তুমি যাকে চাও, তাকেই দান করো কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব ও রাজত্ব। আবার যাকে চাও, ছিনিয়ে নাও তার এমতো অধিকার। যাকে ইচ্ছা, তাকে সম্মানিত করো তুমি, আবার যাকে ইচ্ছা করো অপদস্থ। তোমার অভিপ্রায়ে ও অধিকারেই রয়েছে পৃথিবী ও পরবর্তী পৃথিবীর সকল কল্যাণ। তুমি চিরঞ্জীব, চিরঅব্যয়, চিরঅক্ষয়। তুমি সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টা, সর্বশ্রোতা ও সর্বশক্তিধর। সকলকিছুর উপরে তোমার ক্ষমতা সতত বিদ্যমান। তুমি আমার, আকাশ পৃথিবীর এবং সমগ্র সৃষ্টির এক, অবিভাজ্য ও অংশীবিহীন মালিক।

আমি তোমার অফুরন্ত রহমত কামনা করি, তোমার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ বচনবাহক এবং প্রেমাস্পদ মোহাম্মদ মোস্তফা আহ্মদ মুজতবা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য, যিনি আমাদের অধিনায়ক ও অভিভাবক। আরো রহমত কামনা করি সকল নবী-রসুল এবং সকল নৈকট্যভাজন ও পুণ্যবানগণের জন্য। সর্বশেষে পাপিষ্ঠগণের জন্য এবং তার সাথে পাপিষ্ঠতম এই গ্রন্থকারের জন্য। আমিন। আল্লাহুম্মা আমিন।

'আল্লাহ্র জিকির' গ্রন্থটির রচনা সমাপ্ত হলো আজ ৩রা জিলক্বদ, ১৪৩১ হিজরী। ১১ই অক্টোবর, ২০১০ ইং। রচনার স্থান- অন্ডঙ চেরাই গ্রামের মসজিদ, প্রদেশ-কমপঙ ছেনাঙ, কম্বোডিয়া।

গ্রন্থপঞ্জিঃ * তাফসীরে মাযহারী * তাফসীরে ইবনে কাসীর * তাফসীরে মাআরেফুল কোরআন * বোখারী শরীফ * মুসলিম শরীফ * মেশকাত শরীফ * মকতুবাত শরীফ * মাদারেজুন্ নবুওয়াত * রিয়াযুজ ছালিহীন * ফতোয়ায়ে ছিদ্দিকিয়া * ক্বলব সংশোধন * ফাযায়েলে জিকির * ফাযায়েলে তবলীগ * মুকাশিফাতে আয়নিয়া * নকশায়ে নকশ্বন্দ * বায়ানুল বাকী * তুমিতো মোর্শেদ মহান * নূরে সেরহিন্দ * পাক ভারতের আউলিয়া।